ধর্ম্মজীবন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

বিগত ১৮৯৬ সালে

কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে

প্রদত্ত উপদেশাবলী।

২৬৮২

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY L. M. DAS, AT THE BRAHMO MISSION PRESS,

211, Cornwallis Street

1897.

উপদেশের বিষয়।

১। ধর্ম্মের নিবাস-ভূমি।
২। মানব জীবনের সুখ দুঃখ।
৩। একাধারে দেব ও মানব।
৪। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।
৫। ব্রহ্মানন্দ ও ধর্ম্মবল।
৬। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-মান্দ্য।
৭। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞসস্ব।
৮। ভয়ের ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম।
৯। প্রেমের ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার ধর্ম্ম।
১০। অনুতাপ ও প্রেমের ধর্ম্ম।
১১। বদ্ধ ধর্ম্ম ও মুক্ত ধর্ম্ম।
১২। নাল্পে সুখমস্তি।
১৩। পরমাত্মজাত আত্মা।
১৪। আধ্যাত্মিক আলস্য।
১৫। আধ্যাত্ম-যোগ। (প্রথম উপদেশ)
১৬। ঐ (দ্বিতীয় উপদেশ)
১৭। দিবীব চক্ষুরাততং।
১৮। ধর্ম্মের বহিঃপুর ও অন্তঃপুর।
১৯। ঈশ্বরান্বেষণ।
২০। ধর্ম্মজীবনের উপাদান।
২১। জীবনের উচ্চ আদর্শ।
২২। অপরা বিদ্যা।
২৩। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৬৩৮২
কলিকাতা

ধর্ম্মের নিবাস-ভূমি।*

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ.........তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

উপনিষদ্

অর্থ—সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে দেখিলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়।"

And ye shall know the truth and the truth shall make you free—John Chap. VIII. Vers 32.

অর্থ—তোমরা সত্যকে জানিবে এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত উভয় বচনেরই বক্তব্য বিষয় এক। উভয়েরই উপদেশ এই যে পরম সত্য যিনি তাঁহাকে জানিলে মানবাত্মা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। এই উভয় বচনের যে গভীর তাৎপর্য্য তাহার প্রতি চিত্তকে প্রয়োগ করিলে আমরা ধর্ম্মের উন্নত ও উদার নিবাস-ভূমির কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। যেমন এই ধরাপৃষ্ঠস্থিত বায়ুমণ্ডলে অনেক স্তর আছে, এক এক স্তরের এক এক প্রকার অবস্থা, এবং আমরা ধরাপৃষ্ঠ হইতে যতই ঊর্দ্ধে আরোহণ করি, ততই যেমন এক এক প্রকার বায়ুর অবস্থা দেখিতে পাই, এবং সূর্য্যালোকের এক এক প্রকার নূতন অবস্থা লক্ষ্য করি, তেমনি আমরা জীবনের নিম্নভূমি হইতে যতই ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করি, ততই এক নূতন আধ্যাত্মিক বায়ু অনুভব করিতে থাকি। সেই আধ্যাত্মিক বায়ুর ভাব যে কি তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

যে স্তরে ধর্ম্মের নিবাস সে স্তরের বায়ুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ আত্মার মুক্ত ভাব, অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। আত্মার মুক্তভাব এ কথার অর্থ কি? মুক্তি ও মুক্ত শব্দ ব্যবহার করিলেই বন্ধন মনে পড়ে। আত্মার পক্ষে আবার বন্ধন কি? উপনিষদ যাহাকে হৃদয়-গ্রন্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা

* ১৮৯৬, ২রা ফেব্রুয়ারি, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

কি ? সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, যে কিছু আত্মার ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাহাই বন্ধন। এই বন্ধন কি কি আছে, এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাই যে স্বার্থ ও ভয় প্রথমেই মুমুক্ষু আত্মার গতিরোধ করিবার জন্য মহাবন্ধন রূপে বিদ্যমান। স্বার্থপরতা ও ভয় অর্থাৎ ইষ্টলাভের লোভ ও অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা, এই উভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষ ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ ধর্ম্মত দূরের কথা, এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষ জীবনের সামান্য কর্ত্তব্য কার্য্যও সুচারুরূপে পালন করিতে পারে না। নিজের লাভালাভ ও অপরের অনুরাগ বিরাগ ভুলিতে না পারিলে আমরা প্রকৃত ভাবে সত্যের ও বিবেকের অনুসরণ করিতে পারি না। কিন্তু স্বার্থ সুখাসক্তি ও ভয়ের অতীত হওয়া, তাহাদের উপরে উঠা, মানবের পক্ষে সহজ নহে। মানুষ যদি সত্যের ও ধর্ম্মের শৃঙ্খলকে ঈশ্বরের সিংহাসনের সহিত সম্বদ্ধ দেখিতে না পায় তাহা হইলে কথনই স্বার্থ ও ভয়কে অতিক্রম করিয়া তাহার বশবর্ত্তী হইতে পারে না। মানুষ যখনি তাঁহাকে সত্যভাবে দর্শন করে, তখনি তাঁহাকে ধর্ম্মাবহরূপে দেখিতে পায়, এবং তখনি সে ধর্ম্মে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং স্বার্থ ও ভয়কে অতিক্রম করে। সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে সত্যভাবে প্রতীতি করিলেই আমরা অনুভব করি, যে, এই অত্যাশ্চর্য্য জড় জগৎ যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌতিক নিয়ম সকলের দ্বারা শাসিত, এবং সেই সকল নিয়মের অনুগত না হইলে আমাদের রক্ষা নাই, তেমনি অধ্যাত্ম-জগৎও দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত, যাহার অধীন না হইলে আমাদের রক্ষা নাই। তখনি আমরা ধর্ম্মনিয়মের দুর্লঙ্ঘ্যতা ও অপরিহার্য্যতার উপরে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। অতএব যাঁহারা মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় মুখে ঈশ্বরের ধর্ম্মাবহ স্বরূপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়াও কার্য্যে ধর্ম্মনিয়মের দুর্লঙ্ঘ্যতা বা অপরিহার্য্যতাকে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহারা না জানিয়া সেই পরাৎপর পুরুষের সত্তা ও স্বরূপে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই পরাৎপর পুরুষকে সত্য বলিয়া দেখিলে, মানুষ স্বার্থ ও ভয়ের অতীত হইয়া ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করে। আত্মার এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হইতেই

ধর্ম্মজীবনের অপর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। যে চিত্ত স্বার্থ, সুখাসক্তি ও ভয়ের অতীত সে চিত্ত স্বভাবতঃ পবিত্র। সে চিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সত্যকেই অনুসরণ করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। এইরূপ চিত্তই প্রকৃত ভাবে ন্যায়ের অনুসরণ করিতে পারে। সত্যানুরাগ, ন্যায়পরতা, সংযম, সকলি স্বাভাবিক ভাবে ইহাতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

কেবল যে সুখাসক্তি ও ভয়ই আত্মার একমাত্র বন্ধন তাহা নহে, ধর্ম্মপথের যাত্রীদিগের পক্ষে আরও অনেক প্রকার বন্ধন আছে। এমন কি, শাস্ত্র, গুরু ও বিধি, যাহা ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও অনেক সময়ে বন্ধনের কার্য্য করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছে তাহার পক্ষে ইহারা সহায়, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা জানে নাই, তাহার পক্ষে ইহারা বন্ধন-স্বরূপ। জগতে সকল বিদ্যা ও সকল জ্ঞানের পক্ষে নিয়ম এই যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান মুক্তি ও স্বাধীনতাকে আনিয়া দেয়, এবং পরোক্ষ জ্ঞান মানুষকে বন্ধনের মধ্যে রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সে সমুদায়কে স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে সেই তত্ত্বগুলিকে তাঁহারা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের পরীক্ষার প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে বিদ্যার্থিগণ তৎ তৎ গ্রন্থের সাহায্যে নিজে নিজে পরীক্ষা করিবেন ও সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ আলস্য বা ঔদাসীন্য বশতঃ প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে পরীক্ষা করিয়া না দেখে, তবে তাহাকে গ্রন্থ ও গুরুর উপরেই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হয়; সর্ব্বদাই ভাবিতে হয়, এ বিষয়ে কোন গ্রন্থে কি বলিয়াছে, বা কোন জ্ঞানী কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ যে ব্যক্তি আপনার আত্ম-কোষে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিতে না পারে, তাহাকে অন্ধপ্রায় ধর্ম্মবোধে শাস্ত্র, গুরু ও বিধির সেবাই করিতে হয়। তখন এগুলি তাহার পক্ষে মুক্তির সহায় না হইয়া বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ হয়; তখন সে জীবন্ত, তাজা, সুমিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ধর্ম্মজীবনের বহিঃ-

প্রাঙ্গণে শাস্ত্র, গুরু ও বিধি লইয়াই বিবাদ বিসম্বাদ করিতে থাকে। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য ইহা নহে, যে ধর্ম্মজীবনের সহায়তার পক্ষে শাস্ত্র, গুরু ও বিধি কিছুই নহে ; এইমাত্র বক্তব্য যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল ও বিজ্ঞানবিৎ গুরুগণ সাক্ষাৎদর্শী জ্ঞানীদিগের পক্ষেই প্রকৃত সহায় তেমনি শাস্ত্র, গুরু ও বিধি সাক্ষাৎদর্শী ধার্ম্মিকের পক্ষেই প্রকৃত সহায়। অতএব আমরা সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারিতেছি যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎদর্শন দ্বারাই আত্মা ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করে, এবং সে ভূমির বায়ুর প্রধান লক্ষণ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। সে বায়ুর প্রথম লক্ষণ স্বাধীনতা দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেম। স্বাধীনতা ভিন্ন প্রীতির স্ফূর্ত্তি হয় না ; আবার যেখানে অকপট প্রীতি সেখানেই আত্মার স্বাধীনতা। প্রীতির পদার্পণ মাত্র পরাধীনতার অন্তর্ধান, আবার পরাধীনতার আবির্ভাবে প্রীতির বিনাশ। সর্ব্ববিধ প্রীতির পক্ষে এই নিয়ম। কি ঈশ্বরে প্রীতি, কি সাধুজনের প্রতি প্রীতি, কি সদনুষ্ঠানের প্রতি প্রীতি, কি মানবসাধারণের প্রতি প্রীতি, সর্ব্ববিধ প্রীতিই ধর্ম্মের নিবাস-ভূমির বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান। যে আত্মা সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে দর্শন করে নাই, সুতরাং যে বিবিধ বন্ধনের মধ্যে বাস করিতেছে, সে কখনই অবিমুক্ত প্রীতির সুখ আস্বাদন করিতে পারে না। তাহার ঈশ্বর-প্রীতি বিষয়-সুখলিপ্সার দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহার সাধুজন-প্রীতি জাতীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহার সদনুষ্ঠান-প্রীতি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং তাহার মানব-প্রীতি জাতিভেদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানবের ধর্ম্মভাব উদার ভূমিতে আরোহণ না করিলে তাহার প্রীতি উদার ভাবে সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। চীনদেশীয় সাধু কংফুচ স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিতেন—"মহামনা ব্যক্তি উদার, তিনি সাম্প্রদায়িক নহেন ; ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, সে উদার নহে।"—সাধুদিগের জীবন-চরিতে আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে প্রকৃত ভক্তি যে হৃদয়ে প্রবেশ করে, জাতিভেদ সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। জাতিভেদরূপ মধূখ প্রেমের বাতির স্পর্শেই গলিয়া পড়ে। মানব-প্রীতির পক্ষদ্বয়কে জাতিভেদের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিলে সে প্রেম ঈশ্বরের চরণাকাশে উঠিতে পারে না ; আবার ঈশ্বরের চরণাকাশে যে আত্মা একবার উঠে সে আর জাতিভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীর সকল দেখিতে পায় না। প্রেমের এই এক মহিমা ইহা

পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া ও পূর্ণ অধীনতা আনিয়া দেয়। যেখানে অকপট প্রীতি বিদ্যমান সেখানে একজন সর্ব্বাংশে অপরের অনুগত হইয়াও আপনাকে পরাধীন মনে করে না, সর্ব্বস্ব দিয়া ও কিছু দিলাম ভাবে না। প্রেম এই প্রকারে পরাধীনতাকে স্বাধীনতাতে এবং স্বাধীনতাকে পরাধীনতাতে পরিণত করিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, অথচ আমাদিগের উপরে তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে আমরা ক্রীতদাসের ন্যায় ভয়-ভীত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মনিয়মের অধীন হইব না, কিন্তু প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিয়াই তাঁহার অধীন হইব। এই জন্যই তিনি আমাদিগকে স্বাধীন-সাধ্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন।

স্বাধীনতা ও প্রেমের ন্যায় ধর্ম্মের দেশে আর একটী পদার্থ আছে, তাহা আনন্দ। উহা আত্মার নির্বৃতি বা তৃপ্তি-জনিত। সত্য না পাইলে মানবাত্মা তৃপ্ত হয় না। অন্নের সঙ্গে উদরের যে সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে আত্মার সেই সম্বন্ধ। উদরকে যথাসময়ে অন্ন লাভ করিতে দেও, আর তোমাকে কিছু করিতে হইবে না; অবশিষ্ট সকল কাজ উদর করিবে; সে আর তোমার নিকট কিছু চাহিবে না; সে সেই অন্ন-মুষ্টিকে লইয়া আপনার গূঢ়তম স্থানে রাখিবে, পাকোপযোগী রসের দ্বারা সংযুক্ত করিবে, তদ্দারা দেহ গঠন করিবে। সেইরূপ আত্মা যদি সত্য বস্তুকে পায় তাহা হইলে বলে—"ধন্যোস্মি কৃতকৃত্যোস্মি" আমি ধন্য হইলাম আমি কৃতকার্য্য হইলাম। অর্ণব মধ্যে প্রবল ঝটিকাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্ণবপোত যদি উপযুক্ত বন্দর পায়, তাহা হইলে তদারোহিগণ যেরূপ নিরাপদ ভাব অনুভব করে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গম যদি তরুকোটরস্থিত নিজ কুলায় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যেরূপ তাহাতে বুক রাখিয়া বিশ্রাম ও আরাম লাভ করে, সেইরূপ এই মানব-জীবনের রোগ, শোক, পাপ প্রলোভনের আঘাত ও আন্দোলনের মধ্যে মানবাত্মা যদি একবার সেই সত্য-জ্যোতি দর্শন করে, তাহা হইলে অভয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে সত্যাশ্রয়-লাভ-জনিত মানব-চিত্তের আশাপূর্ণ সন্তোষের অবস্থা তাহাকেই নির্বৃতি বলা যায়। এ কথাতে এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, ধর্ম্মের ভূমিতে আরোহণ করিলে আর মানব-জীবনে সংগ্রাম থাকে না। এতদ্দেশের ধর্ম্মসাধকগণ এক প্রকার শান্তির প্রয়াসী যাহার অপর নাম সংগ্রাম-রাহিত্য। আত্মার সংগ্রাম

রহিত নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন; এবং তাঁহারা যে কিছু সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সকলের একই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হওয়া। কিন্তু ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ আর একপ্রকার শান্তির প্রয়াসী। তাঁহারা বলেন—জীবনের সকল প্রকার পরীক্ষাও আন্দোলনের মধ্যে আশা ও প্রেম যদি আমাদের হৃদয়কে পরিত্যাগ না করে, যদি সত্যস্বরূপের সত্যজ্যোতি আমাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত না হয়, তাহা হইলেই আমরা সুখী। যেদেশে ধর্ম্মের বাস সে দেশে এই প্রকার সুখ সাধকচিত্তে সর্ব্বদাই বিদ্যমান।

ধর্ম্ম কি এ বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোনও ধর্ম্ম সম্প্রাদয়ের মতে ধর্ম্ম এমন কতকগুলি কার্য্য যদ্দ্বারা স্বর্গবাসের উপযুক্ত হওয়া যায়, বা কর্ম্মভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; কাহার কাহারও মতে ধর্ম্ম এমন কতকগুলি আচরণ যদ্দ্বারা কুপিত ঈশ্বরের কোপ শান্তির উপায় বিধান হয়; কিন্তু আমাদের মতে ধর্ম্ম সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহাতে আরোহণ করিলে আত্মা স্বাধীনতা, পবিত্রতা, প্রেম ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ঈশ্বর-চরণে বিহার করিতে থাকে। ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না, পরকালের খাতাতে জমার ঘরে লিখিতে হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে হয়। প্রকৃত প্রেমিক ও ভক্ত ধার্ম্মিকের পক্ষে ধর্ম্ম শিশুর স্কন্ধে আরোপিত প্রৌঢ়ের পোষাকের মত নহে, কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক। ইহা তাঁহাদের উত্থান ও শয়নে, অশনে বসনে প্রকাশ পায়। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ ধর্ম্মের এই স্বাভাবিকতার নিদর্শন স্বরূপ। বুদ্ধ যীশু মহম্মদ সকলেরই জীবনে দেখিতে পাই যে ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই বাস করিয়াছে। মহাত্মা বুদ্ধের জীবনে ইহার অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু যখনি মনে করিলেন যে সত্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখনি পূর্ব্বকার কঠোর তপস্যার অনাবশ্যকতা ও অকিঞ্চিৎ-করতা অনুভব করিলেন, এবং ধর্ম্ম সাধনের জন্য মধ্য পথই অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। মহাত্মা যীশুও পরিষ্কার রূপেই বলিতেন যে তাঁহার ধর্ম্ম কৃচ্ছ্র সাধনের ধর্ম্ম নহে। তিনি বলিতেন,—"জন উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের উপদেশ দিতেন, আমি নিয়মিত আহার বিহারের উপদেশ দিয়া থাকি।"

মহম্মদেরও ধর্ম্ম ভাব অতিশয় স্বাভাবিক ছিল। তিনি সাধনাবস্থাতে হয়া পর্ব্বতের গুহাতে অনেক দিন নির্জ্জন চিন্তাতে ও কঠোর তপস্যাতে যাপন করিয়াছিলেন বটে,, কিন্তু যখনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখনি তাঁহার ধর্ম্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গেল। তখন তিনি বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এই সকল মহাজনের জীবন আলোচনা করিলেই গীতার একটী বচনের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতার একটী বচনে আছে :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

অর্থ—হে অর্জ্জুন, যে অত্যন্ত আহার করে বা একেবারে অনাহারে থাকে, যে অতিমাত্র নিদ্রা যায় বা অত্যন্ত জাগরণ করে তাহার যোগ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি পরিমিত আহার বিহার, পরিমিত শ্রম, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত জাগরণ করিয়া থাকে, যোগ তাহারই দুঃখ হানির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।" সত্যের সাক্ষাৎ দর্শনের নামই সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধিলাভ হইলে মানবাত্মা এরূপ তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে যে চিত্ত তখন নিরুপদ্রবে, নিরুদ্বেগে, ধর্ম্মের ভূমিতে সর্ব্বদা বাস করিতে থাকে।

১৬৬২

মানব-জীবনে সুখ দুঃখ।*

বিশ্বানি দেব সবিত দুর্রিতানি পরাসুব।

—শ্রুতি।

অর্থ—"হে দেব হে পিতা আমাদের পাপ সকল হরণ কর।"

অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই মানুষ বুঝিয়াছে যে, সে পাপী, এবং সেই প্রাচীনতম কাল হইতেই, "পাপ তাপ হইতে উদ্ধার কর" এই প্রার্থনা মানব-মুখে ফুটিয়াছে। নানা দেশের নানা জাতির ধর্ম্মসাধকগণ ধর্ম্ম-সাধনের যে সকল প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, দার্শনিকগণ যে সকল দর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও পাপ হইতে নিস্কৃতি দেওয়া। মানব-জীবনে এই দুঃখ ও পাপ কিরূপে প্রবিষ্ট হইল?

একবার ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে কোনও স্থানে গিয়াছিলাম, সেখানে কতিপয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টান প্রচারকের সহিত আমার বিচার উপস্থিত হয়। তাঁহারা আমাকে প্রশ্ন করিলেন, মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার রাজ্যে পাপ ও দুঃখের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে তোমাদের কি মত? আমি বলিলাম, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কেন যে তিনি পাপ ও দুঃখকে থাকিতে দিলেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি মঙ্গলময়, নিশ্চয় ইহার মূলে তাঁহার কোনও মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে।

ইহাতে ঐ খৃষ্টীয় প্রচারকগণ সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন তোমাদের মানবের মনঃকল্পিত ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা দেখ, এমন একটা গুরুতর বিষয়ে তোমাদের ধর্ম্ম কোনও

* ১৮৯৬, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

একটা সদুত্তর দিতে পারে না। আমি প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, আপনারা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়া থাকেন?" তাঁহারা বলিলেন,—"কেন আমাদের উত্তর অতি সহজ; পাপ মানবের আদি পিতামাতার অবাধ্যতা বশতঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং ঈশ্বরের শত্রু শয়তান ঈশ্বরের জগতে দুঃখরূপ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে।" আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা ঈশ্বর মানবের আদি পিতামাতাকে এমন করিয়া কেন সৃষ্টি করিলেন, যে তাঁহাদের পক্ষে পতন সম্ভব হইল? দ্বিতীয়তঃ শয়তান যে জগতে দুঃখ আনিয়াছে, সে ঈশ্বর অপেক্ষা বলবান অথবা তাঁহার সমকক্ষ কি না?" তাঁহারা বলিলেন, "না শয়তান ঈশ্বর অপেক্ষা কখনই বলবান নহে, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তাহা যদি হয়, তবে সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিধাতা কেন শয়তানকে বিনাশ করিলেন না, বা কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন না, তাহা হইলে ত সৃষ্টিতে দুঃখ প্রবেশ করিতে পাইত না। যদি বলেন, ঈশ্বর নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা সত্বেও কোনও অপরিজ্ঞাত মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শয়তানকে দুঃখ দিবার স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন, তবে এ কথা বলিলে দোষ কি যে তিনি কোনও অপরিজ্ঞাত মঙ্গলকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে পাপে ও দুঃখে পড়িবার শক্তি ও স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন।"

সেই একদিনের বিচারে যে কঠিন প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নে যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে। সে প্রশ্নটী এই—মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে পাপ ও দুঃখ কেন? এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মসাধকদিগের মনে উঠিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকে ইহার একটা সহজ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং সে মীমাংসা তৎকালের জ্ঞানের অবস্থাতে তাঁহাদের মনের পক্ষে সন্তোষজনক বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে, জগতে দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তি কার্য্য করিতেছে, এক মানবের অনুকূল অপর মানবের প্রতিকূল। প্রাচীন পারস্যবাসী অগ্ন্যুপাসকদিগের মধ্যে এই মত অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাঁহারা আহুরা মাজদা ও অঙ্গ্রমন্যু বা আহিরমান এই দুইটী শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই এই মত

য়িহুদীদিগের মধ্যে ও তৎপরে খ্রীষ্টধর্ম্মে ও ইস্‌লাম ধর্ম্মে সংক্রান্ত হইয়াছে। এতদ্দেশেও প্রাচীন পৌরাণিক ধর্ম্মে দেবাসুরের বিবাদে এই মতেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও অনেক অসভ্যজাতি দুইটী ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এক ভাল ঈশ্বর ও আর এক দুষ্ট ঈশ্বর। তাহারা দুষ্ট ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনা করিয়া থাকে, কারণ ভাল ঈশ্বর অনিষ্টকারী নহেন। জগতে সুখ ও দুঃখের উৎপত্তিকে দুই বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী শক্তির কার্য্য বলিয়া প্রাচীনকালের সাধকগণ আপনাদিগকে একপ্রকার পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান যে সকল মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, একই অনাদি ও অবিনশ্বর শক্তি বিবিধ আকারে এই ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছে, এবং এ জগতে যে সকল ভৌতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত তাহাদের কার্য্য সর্ব্বত্রই একপ্রকার। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এ ব্রহ্মাণ্ড সমগ্রভাবে এক। সুতরাং যদি এ ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জ্ঞানসম্পন্ন আদিকারণ মানিতে হয়, তবে সে আদিকারণ যে এক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ জগতের পদার্থ সকল ও ক্রিয়া সকল এত ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ও এত প্রকারে পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে যে, হয় বল যে এই জগচ্চক্রের উপরে একজনেরই হাত, না হয় যদি ইহার একাধিক প্রভু মানিতে হয়, তবে বল, তাঁহাদের একটী সভা আছে, এবং সে সভার পরামর্শে কখনও মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় না। ফলতঃ জগৎকারণের একত্ব বিষয়ে অধুনাতন বিজ্ঞান আমাদিগকে নিঃসংশয় করিয়াছে।

জগৎকারণ যদি এক হইলেন তবে তাঁহার রাজ্যে সুখ ও দুঃখ কিরূপে একত্রে বাস করিতেছে? ইহার উত্তরে আমরা বলিয়া থাকি, পরস্পর-বিরোধী ও পরস্পর-বিসম্বাদী পদার্থ দ্বয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত বা বিস্মিত হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ পরস্পর-বিরোধী পদার্থ তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যের আরও অনেক স্থানে রহিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুর উপরে একই সময়ে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কার্য্য করিতেছে, একের নাম কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি, অপরের নাম কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি।

কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি প্রত্যেক পরমাণুকে কেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি প্রত্যেক পরমাণুকে প্রতি মুহূর্ত্তে কেন্দ্র হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। কেহ বলিতে পারেন, বিধাতার একি কৌতুক করা যে তিনি একই বস্তুর উপরে একই সময়ে দুই প্রকার শক্তি প্রয়োগ করিলেন? তদুত্তরে বিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, তদ্ভিন্ন এই পৃথিবী এমন সুন্দর গোলাকৃতি ধারণ করিত না। এইরূপ মানব-সমাজের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ও মানব-হৃদয়ে নিমগ্ন হইয়া দেখ, একই মানবহৃদয়ে একই সময়ে ক্রোধ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি স্বার্থরক্ষিণী ও প্রেম দয়া প্রভৃতি পরার্থ-রক্ষিণী বৃত্তি সকল কার্য্য করিতেছে। যদি বল এমন কেন হইল, তদুত্তরে বক্তব্য, এরূপ না হইলে, জনসমাজের উন্নতি সম্ভব হইত না। পরার্থরক্ষিণী বৃত্তির অভাবে মানবগণ পরস্পর হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্য শ্বাপদকুলের অবস্থাতে থাকিত, আবার স্বার্থরক্ষিণী বৃত্তি নিচয়ের সম্পূর্ণ অভাব হইলে প্রত্যেক মানব আত্মরক্ষাতে অসমর্থ হইয়া ঘোর সামাজিক দাসত্বে পরিণত হইত। সেইরূপ আমরা বলিতে পারি, মানবকে বিকশিত, বর্দ্ধিত, সবল ও কার্য্যক্ষম করিবার জন্য সুখ দুঃখ উভয়েরই প্রয়োজন। দুঃখের তাড়না না থাকিলে জীব-জগতে বর্ত্তমান উন্নতি ও বিকাশের কিছুই লক্ষিত হইত না। বাঘে না তাড়িলে হরিণের পদদ্বয় দীর্ঘ ও ধাবনক্ষম হইত না।

কেহ হয়ত বলিবেন যে সকল বিষয়ে মানুষের কোনও হাত নাই, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ঈশ্বরাভিপ্রায় যেন একপ্রকার বুঝা গেল, কিন্তু মানব যে নিজ পাপ-নিবন্ধন দুঃখ উৎপন্ন করে, মঙ্গলময় বিধাতা ইহা মানবের পক্ষে সম্ভব করিলেন কেন? এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই মানবাত্মার স্বাধীনতা-রূপ মহাজটিল প্রশ্নের মধ্যে পতিত হইতে হয়। যদি বল এ জগতে মানবাত্মা যাহা কিছু করে তাহা করিতে সে বাধ্য, সে বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে সে সকল কার্য্যের জন্য মানবের দায়িত্বও নাই, এবং তন্নিবন্ধন দণ্ড ও পুরস্কারও নাই। সুতরাং আইন, আদালত, কারাগার এ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর নাই। যদি কোনও ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী তোমার উদ্যানের ফল খাইয়া যায়, তবে সে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হয় না; অথবা তোমার কুকুর যদি তোমার জলমগ্ন বালকের বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া

তীরে তোলে তাহা হইলে মহাধার্ম্মিক কুকুর বলিয়া কোনও সভার প্রদত্ত স্বর্ণ পদক পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় না। মানবের সম্বন্ধেই যে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, অথবা দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, তাহার কারণ এই, যে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বিশ্বাস করি যে মানব সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়, পাপ ও পুণ্য উভয় জানিয়া একেকে গ্রহণ ও অপরকে বর্জ্জন করিয়া থাকে এবং সেরূপে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে। সে যখন অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তখন আমরা মনে করি সে শক্তি থাকিতেও সৎকে ছাড়িয়াছে, সেই জন্য সে নিন্দনীয়। আবার যখন সে সৎকে অবলম্বন করে তখন মনে করি শক্তি থাকিতেও অসৎকে বর্জ্জন করিয়াছে, সেই জন্য সে প্রশংসনীয়। এই সৎ ও অসতের ঘাত প্রতিঘাতের সন্ধিস্থলেই ধর্ম্মের উৎপত্তি; ইহা না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না।

কিন্তু ইহার অন্তরালে আর একটী প্রশ্ন নিহিত আছে, যাহা যুগে যুগে ধর্ম্মসাধকদিগকে মহাসমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আমরা চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই মানবের বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি, যাহা মানবের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করে, এবং মানবের বিচারশক্তি, যাহা সত্যাসত্য বিচার করে, উভয়ই ভ্রান্তিশীল। মানবজাতির ইতিবৃত্তে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যে কোনও জাতি এক সময়ে কোন কার্য্যকে অতি প্রশংসিত কার্য্য মনে করিত, আবার জাতীয় চিন্তার পরিবর্ত্তন সহকারে তাহাকেই নীতি-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগত জীবনেও দেখি মানুষ আজ যে কার্য্যকে ধর্ম্মকর্ম্ম বোধে আচরণ করিতেছে, কিয়দ্দিন পরে, তাহাকেই ঘোর অধর্ম্মবোধে পরিত্যাগ করিতেছে। তবে ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশের উপরে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার উপায় কোথায়? বিচারশক্তির ত কথাই নাই—তাহা আজ যাহাকে সত্যবোধে গ্রহণ করে কল্য তাহাকে অসত্যবোধে পরিত্যাগ করে। এখন প্রশ্ন এই মানবের ধর্ম্মজীবনও পরিত্রাণের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার কি এমন সন্দেহাকুল ও চঞ্চল ভিত্তির উপরে স্থাপন করা যায়? অথবা করা কি যুক্তিসঙ্গত? অনেক সাধক মনে করিয়াছেন, যে এরূপ ভিত্তির উপরে মানবের ধর্ম্মজীবন স্থাপিত

হইতে পারে না। এই কারণে তাঁহারা মানবের পরিত্রাণকে ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ভ্রান্তিশীল ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে স্থাপন না করিয়া ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীর উপরে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভ্রান্ত-বাণী জানা যায় কিরূপে? কোন কোনও সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মানবাকার ধারণ করিয়া ধরাধামে মানবকুলের মধ্যে বাস করিয়া মানবীয় ভাষাতে তাঁহারা উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থবিশেষে সেই সকল উপদেশ সংকলিত হইয়া রহিয়াছে, তদনুসারে আপনার জীবনকে গঠন কর, পরিত্রাণ পাইবে। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক কঠিন কঠিন আপত্তি উঠিয়াছে। তাহার কোন কোনওটী মারাত্মক, তাহার আর উত্তর দিবার উপায় নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন ঈশ্বর যে ঐ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? অপর কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যেগুলি তাঁহার উক্তি বলিয়া সংগৃহীত হইয়েছে, তাহা যে বস্তুতঃ তাঁহারই উক্তি, তন্মধ্যে মানবীয় কিছু যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? তৃতীয়তঃ কেহ বলিতে পারেন, সেই উক্তি গুলির নানাবিধ অর্থ হইতে পারে, তোমার অবলম্বিত অর্থই যে ঈশ্বরের অর্থ তাহার প্রমাণ কি? এই আপত্তিটী মারাত্মক, কারণ যদি আমার ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ভ্রান্তি-শীল ধর্ম্মবুদ্ধিকেই বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় করিতে হইল, তবে আর অভ্রান্ত ঈশ্বরীয় শাস্ত্র পাইয়া কি লাভ হইল? যদি বল মহাজনদিগের প্রণালী দর্শনে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুভব করিতে হইবে। তাহা হইলে বলি, মহাজনদিগের মধ্যে যখন মতদ্বৈধ বিদ্যমান, তখন আমি কাহাকে অবলম্বন করি? এবং সেই অবলম্বন বিষয়েও ত আমার ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধিই ত বিচারক। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঈশ্বর যে কোনও কালে ধরাধামে আসিয়াছিলেন, আর আজ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি এখনও বিশেষ বিশেষ আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া অভ্রান্ত মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, অতএব মুক্তির জন্য গুরু বিশেষকে আশ্রয় করিতে হইবে। যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় এই বিশেষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কে আমার পরিত্রাণের পক্ষে সমর্থ কিরূপে জানিব? তাহাতেও ত আমাকে ভ্রান্তিশীল বিচারশক্তি ও

ভ্রান্তিশীল ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে হইবে। তাহার উত্তরে ইহারা হয় ত বলিবেন যে, গুরু নির্ণয় করা পর্য্যন্ত তোমার বিচারশক্তির কাজ আছে; তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তাহা করিবে; কিন্তু একবার গুরু নির্ণীত হইলে আর তোমার বিচারশক্তির প্রয়োজন নাই; তখন তুমি অবিচারিত চিত্তে গুরুর আদেশ পালন করিবে। ইহা বলিলে এই কথা বলা হয়, যখন তুমি কোনও একটা বিশেষ ভবনে যাইতেছ, তখন পথে তোমার দুইটী চক্ষের প্রয়োজন, তুমি চক্ষু খুলিয়া পথ দেখিয়া সেই ভবনের পথ নির্ণয় কর। কিন্তু সে ভবনের দ্বারে যখন পৌঁছিবে, তখন দুইটী লৌহশলাকার দ্বারা দুইটী চক্ষু বিদ্ধ ও অন্ধ করিয়া দ্বারবানের হস্তে আপনার হস্ত অর্পণ কর, তৎপরে সে তোমাকে যেখানে বসাইবে সেইখানে বস, যেখানে লইয়া যায়, সেখানে যাও। এরূপ উপদেশের যুক্তিযুক্ততা আমরা অনুভব করি না। ঐশ্বরিক প্রেরণা যদি আমার ভ্রান্তশীল বিচারশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গুরু সন্নিধানে লইতে পারে, তবে সেই ঐশ্বরিক প্রেরণা কেন আমাকে স্বাধীন রাখিয়া ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পথে লইতে পারিবে না?

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বিভিন্ন প্রকার মতের উল্লেখ ও সমালোচনা দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতে চাহিতেছি যে, আমাদের বিচারশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি ভ্রান্তিশীল হইলেও তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাকে সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাই আমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়, এবং তদুপরেই আমাদের ধর্ম্মজীবকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এ ভিত্তি সময়ে সময়ে সংশয়াকুল হইলেও গত্যন্তর নাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা গিয়াছে, মানবের ধর্ম্মজীবনকে এ ভিত্তি হইতে তুলিয়া যাঁহারা অপর কোনও ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই মানবজীবনকে দুর্গতি প্রাপ্ত করিয়াছেন; মানবাত্মার এবং মানবসমাজের উন্নতি ও বিকাশের পথে মহা অর্গল স্থাপন করিয়াছেন; এবং চিন্তা ও সাধনার একতা স্থাপনে মহাপ্রয়াসী হইয়াও একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। রাত্রিকালে তোমার দ্বারে যে কুকুর শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকে আফিং খাওয়াইয়া যদি ঘুম পাড়াও, তবে যেমন তোমার ঘরে

চুরি হইবার সম্ভাবনা, তেমনি মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বিচারশক্তিকে হরণ করিয়া যদি ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন কর, তবে ধর্ম্মধন অপহৃত হইবার সম্ভাবনা। তবে কি ভ্রান্তিশীল মানব সম্পূর্ণরূপে আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে? গুটিপোকার গুটি যেমন তাহারই দেহ বিনিঃসৃত তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাবত ব্যাপার কি কেবল মানবেরই বুদ্ধি-প্রসূত? ঐশ্বরিক প্রেরণা কি তন্মধ্যে কিছু নাই? ইহা কে বলিবে? যেমন জগতের সমুদায় তাপ সূর্য্যেরই অভিব্যক্তি, তেমনি সমুদায় সত্য ও সমুদায় মঙ্গলভাব ঈশ্বরেই অভিব্যক্তি। ভ্রান্তিশীল মানবকে স্বাধীন রাখিয়াও তিনি তাহাকে আপনার অভিমুখে লইয়া যান এই তাঁহার মহত্ত্ব। তিনি আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়াও আপন ইচ্ছার পূর্ণ অধীন করিয়া লইতে পারেন, এই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল।

একাধারে দেব ও মানব। *

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—

উপনিষদ্।

অর্থ—দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে; ইহারা উভয়ে উভয়ের সখা।”

দুই সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এক বৃক্ষকে অর্থাৎ এক দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। যে ঋষি এই বচন রচনা করিয়াছিলেন, তিনি আপনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া এমন কি দেখিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার বোধ হইল যে এই দেহ-মন্দিরে দুইজন বাস করিতেছে, একজন ফল-ভোক্তা অপর জন দ্রষ্টা? আমরা ও কি আত্মদৃষ্টি দ্বারা আত্ম-পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে, ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকি?

মানবাত্মার দুই একটী বিভাগ আছে, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই দ্বিত্ব-বুদ্ধি মনে প্রবল হয়। ইতর প্রাণিগণের সহিত তুলনা করিলে একটী গুরুতর বিষয়ে মানবের প্রভেদ দেখিতে পাই। ইতরপ্রাণিগণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট। তাহারা যদি ক্ষুধার অন্ন পায় ও প্রতি মুহূর্ত্তের প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিবার উপযোগী পদার্থ পায়, তাহা হইলেই তাহারা তৃপ্ত থাকে; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা আর অধিক দূরে যায় না; ক্রোড়স্থিত পদার্থকে অবজ্ঞা করিয়া তাহারা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু মানব তাহা করিয়া থাকে। মানব সর্ব্বদাই বর্ত্তমানে অসন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী। মানব প্রকৃতিই এইরূপ দেখি যে, কোনও একটী বিষয় যতদিন অজ্ঞাত ছিল, ততদিন মন তাহা জানিবার জন্য উৎসুক ছিল, জানিতে না পারিয়া অসুখী ছিল, যখন তাহা জানিল তখন সুখী হইল বটে, কিন্তু তৎপরক্ষণেই তাহাতে ঔদাসীন্য বুদ্ধি আসিল; এবং চিত্ত সম্মুখে যাহা আছে

* ১৮৯৬, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

তাহা জানিবার জন্য আবার ব্যগ্র হইল। এইরূপে মানব-মন নিরন্তর ক্রোড়স্থিত পদার্থকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে; জ্ঞাত বিষয়কে পশ্চাতে রাখিয়া অজ্ঞাত রাজ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইতেছে! মানবের এই যে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ইহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে ইহার সীমা পাই না। মানবের জ্ঞানস্পৃহা যাহা চাহিতেছে তাহা দেও, এবং তার পর, তার পর, করিয়া প্রশ্ন কর ও দিতে থাক, দেখিবে এমন একটী রেখা কোথাও পাইবে না, যাহার পর মানব-জ্ঞান আর কিছু চাহিবে না। অতএব দেখিতেছি যে, মানবের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা অসীম ও অনন্ত-মুখীন। কেবল জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নহে মানবপ্রকৃতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাও এইরূপ অসীম ও অনন্ত-মুখীন। মানবাত্মাতে এই এক আশ্চর্য্য দ্বিত্বভাব। একজন প্রতিমুহূর্ত্তে বিষয় সকল ভোগ করিতেছে আর একজন কে যেন হৃদয়ে থাকিয়া বলিতেছে, "অনন্ত উন্নতি তোমার জন্য আছে, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!" মানবাত্মার এই অতৃপ্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনেক চিন্তাশীল সাধক বলিয়াছেন যে, ইহা পরমাত্ম-সত্তার একটী প্রমাণ-স্বরূপ। মানব এ সংসারে একাকী বাস করিতেছে না; তাহার হৃদয়-মধ্যে আর একজন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। কোনও কোনও সাধক এই অতৃপ্তির আরও অন্তরালে প্রবেশ করিয়া আরও একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই অতৃপ্তি যে কেবল অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে প্রেরণ করিতেছে, তাহা নহে, কিন্তু সেই ভবিষ্যতকে আশার সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইতেছে। এই আশাই মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখিতে পাই, অতীত ও বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা ভবিষ্যতের বিচার করিয়া থাকি। তোমার প্রতি কোনও কার্য্যের ভার দিয়া যদি দশবার দেখি যে, তুমি নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য কর না, তবে আর তোমায় প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। এক ব্যক্তি যদি কথা দিয়া দশবার সে কথা ভঙ্গ করে, তবে তাহার কথার প্রতি নির্ভর রাখিতে পারি না। প্রতিদিন প্রাতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়

জন্য, কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না ; এজন্য সূর্য্যোদয়ের প্রতি অবিচলিত আস্থা স্থাপন করিয়াছি ; কিন্তু দশ দিন যদি এমন হয় যে প্রাতে পূর্ব্বাকাশে আর সূর্য্য আসিল না, তাহা হইলে আর প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবিতার প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না। এই ত মানব-মনের স্বভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। নিজের জ্ঞান, প্রেম, ও পুণ্যভাব সম্বন্ধে অক্ষয় আশা আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।- নিজ আত্মাকে পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই যে, একটী শুভ সংকল্পকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দশবার শতবার দুর্ব্বলতা বশতঃ সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, প্রবৃত্তিকুলের নিকট পরাস্ত হইয়াছি, অথচ প্রাণের মধ্যে থাকিয়া কে যেন বলিয়া দিতেছে যে, চরমে প্রেম ও পুণ্যের জয় হইবেই হইবে, আমার সম্মুখে যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট, এবং আমার বর্ত্তমান জীবন নিকৃষ্ট, অথচ আমার সহস্র দুর্ব্বলতা সত্বে আমি একদিন ঐ উচ্চ ভূমিতে উঠিবই উঠিব। এইরূপে জীবন সংগ্রামে আমরা বার বার প্রবৃত্তিকুলের দ্বারা পরাজিত হইতেছি, আবার যেন উঠিয়া অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার আশা করিতেছি। এমন কেন হয়? সর্ব্বত্রই যে নিয়মানুসারে বিচার করি, নিজের বেলা কেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে? নিজের বেলা শতবার পরাস্ত হইয়াও কেন জয়ের আশা করি? শতবার পতিত হইয়াও কেন উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা দেখি? বর্ত্তমান সময়ের একজন ঋষি বলিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণ, পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। এই আশার বাণী তাঁহারই। তিনি হৃদয়কে প্রেরণা করিয়া বলিতেছেন—"নিরাশ হইও না ; ভগ্নোদ্যম হইও না ; সত্য, প্রেম ও পুণ্যে সর্ব্বদা আশান্বিত থাক; চরমে এ সকলের জয় হইবেই হইবে।" ঈশ্বর মানব-হৃদয়ে বাস করিতেছেন বলিয়া মানুষ সত্যেতে ও সাধুতাতে বিশ্বাস রাখিতেছে। এই বিশ্বাস এমনি স্বভাবিক যে মানুষ হাজার দুঃখের চক্ষে জগতকে ও মানব-সমাজকে দেখিলেও এ বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, যে সকল সাধক জনসমাজকে কুৎসিত ও ধর্ম্মের বিরোধী এবং মানব-প্রকৃতিকে পাপ-প্রবণ জানিয়া এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন, তাঁহারাও

স্থলে বসিয়া শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহার মূলে প্রবেশ করিলে কি দেখিতে পাই? মানবকে সত্য দিলে সে সত্য গ্রহণ করিবে এ বিশ্বাস যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি ঐ সকল শাস্ত্রকর্ত্তা শাস্ত্র-রচনার ক্লেশ স্বীকার করিতেন? তবে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ এরূপ বিকৃত নয় যে সত্যালোক তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রবেশ করিবার অবসর পাইবে না। অথবা সত্যের ও ধর্ম্মের শক্তিতে মানবের এমনি স্বাভাবিক বিশ্বাস যে, মানব-বিদ্বেষের কঠিন চাপেও তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্বাসের চক্ষে দেখ এই অবিনশ্বর ও দুর্দ্দমনীয় বিশ্বাস ও আশার মধ্যে বিধাতা বর্ত্তমান; দেব ও মানব একাধারে বাস করিতেছেন; এই দিকে আমাদের প্রকৃতি তাঁহার সহিত সংসৃষ্ট রহিয়াছে।

আর একদিক দিয়া দেখিলে আমরা দেব ও মানবকে একাধারে দেখিতে পাই। মানব-হৃদয়ের যে ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার প্রকৃতিও রহস্যময়। এই ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রকৃতি কি ও ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই বিচারে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বহুদিন ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সে তর্কারণ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এই ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়াছে। ইহার অনুরূপ বৃত্তি আর কোনও প্রাণীতে দৃষ্ট হয় না। অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ এই দুইটী অবস্থা কেবল মানবেই অনুভব করিয়া থাকে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত এই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদকে নানারূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহার মূলে কেবল মানবের নিন্দা ও স্তুতি। অর্থাৎ জনসমাজে বাস করিয়া কতকগুলি কার্য্যকে নিন্দিত ও অপর কতকগুলিকে প্রশংসিত দেখিয়া আসিতেছি, দেখিয়া দেখিয়া তত্তৎ কার্য্যের সঙ্গে নিন্দা বা স্তুতির ভাব জড়িত হইয়া গিয়াছে, এখন সেই সকল কার্য্য দেখিলে বা চিন্তা করিলে সেই সঙ্গে নিন্দাজনিত ভয় বা প্রশংসাজনিত আনন্দের উদয় হয়; তাহাই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদের আকার ধারণ করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জনসমাজের নিন্দা ও স্তুতি পূর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরা হইতে আমাদের দেহমনের সঙ্গে গঠিত হইয়া আসিয়াছে, এখন আমাদের যে অনুতাপ বা আত্ম-প্রসাদ হইতেছে, তাহা কতকটা স্বাভাবিক ক্রিয়া। তদুপরি আমা-

দের বা জনসমাজের হাত নাই। এইরূপে ধর্ম্মবুদ্ধিকে উড়াইয়া দিবার জন্ম যিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা কিছুই সন্তোষ-জনক হয় নাই। ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম্মবুদ্ধি যে তুলাদণ্ড হস্তে ধরিয়া কেবল সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, বিচার করে তাহা নহে, কিন্তু অসৎকে বর্জ্জন করিয়া সৎকে গ্রহণ করিবার জন্ম চিত্তকে প্রেরণা করে; এবং অসৎকে গ্রহণ করিলে চিত্তকে তিরস্কার করে। এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার যে কিরূপ তাহা আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি। এই প্রেরণা ও তিরস্কার সময়ে সময়ে আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। আমরা আহার বিহারে শান্তি পাই না; সজন হইতে নির্জ্জনে যাই, নির্জ্জনতা আমাদিগকে এই হৃদয়স্থ সাক্ষীর নিকট হইতে লুকাইতে পারে না! আমরা জনকোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করি, আমোদ-তরঙ্গে ভাসিবার প্রয়াস পাই, কিন্তু সেই কোলাহল ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার আমাদিগকে শান্তিহীন করিয়া ফেলে! সকল কোলাহলের মধ্যে এক বাণী পরিষ্কাররূপে শুনিতে পাই, যাহা বলে—"রে পামর, তুমি বৃথা কেন আপনা হইতে আপনাকে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছ?" অমনি আমাদের সকল সুখ বিষাক্ত হইয়া যায়। প্রশ্ন এই, এই প্রেরণা ও এই তিরস্কার কার? যদি বল ইহা আমাদেরই,—আমাদেরই এক চিন্তা অপর চিন্তাকে প্রেরণা করে বা লজ্জা দেয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, এই প্রেরণা ও এই তিরস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্ম, এই যাতনা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ম, আমরা আত্ম-পক্ষসমর্থনের প্রয়াস পাই; আপনাদের অপরাধ ভার লঘু করিবার নিমিত্ত যুক্তির পর যুক্তি পরম্পরা উদ্ভাবন করি। যে অবস্থাকে ক্লেশকর মনে করিয়া আমরা যাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাই, তাহা আমাদের সৃষ্টি কিরূপে বলিতে পারি? যাহা আমি গড়ি তাহা আমি ভাঙ্গিতে পারি। এই অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ যদি আমার গড়া পদার্থ হয় তবে ইহা আমি ভাঙ্গিতেও পারি। যখন দেখিতেছি যে, আমার সহস্র চেষ্টা সত্বেও আমি ইহাদিগকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে পারিতেছি না, তখন ইহা আমার মনের সৃষ্টি নহে, ইহা অপর কাহারও। এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিলেই আমরা

অনুভব করি যে, আমাদের প্রকৃতি এই আর এক দিকে সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে,—যেন দেব ও মানব একস্থানে ও একাধারে বাস করিতেছে।

এই দেহে ও এই জগতে মানব একাকী বাস করিতেছে না, আর একজন তাহার আত্মাতে সন্নিহিত হইয়া আছেন ইহা যদি সত্য হইল, তাহা হইলে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠিতেছে, মানবের প্রতি দিনের কার্য্যের মধ্যে মানব কতটা করে ও তিনি কতটা করেন; মানব ও দেবের কার্য্যের পরিচ্ছেদ-সীমা কোথায়? এ জগতে মানবের কতদূর করিবার সাধ্য আছে, এবং কতদূর নাই তাহা চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের বিচার বিষয়ে অনেক সহায়তা হইতে পারে।

প্রথম মানবের বাহ্য সম্পদ ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে চিন্তা করা যাউক। তাহার কতটার উপরে মানবের হাত আছে? আমরা সকলেই বর্ত্তমান সভ্য জগতের সুখ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। বাস্তবিক তাহা যে বিস্ময়কর ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিম বর্ব্বর অবস্থাতে মানুষ যখন নগ্নদেহে বনে বনে ভ্রমণ করিত, আম মাংস ভোজন করিত, তরুকোটরে বা গিরিগুহাতে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া শীতাতপে আপনাদিগকে রক্ষা করিত, প্রস্তরের দ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, ভূমিকর্ষণ বা বীজবপন করিতে জানিত না, সেই অবস্থার সহিত সভ্য-জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থার-তুলনা করিলে কি বিস্ময়কর ব্যাপারই আমা-দিগের সমক্ষে উপস্থিত হয়! মানব জাতির এই অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধির বিষয় একবার চিন্তা কর, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল রাজধানীর ও মহানগরের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা কর, সেই সকল মহানগরে যে সকল ধনরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা একবার কল্পনা কর, নানাদেশে যে লক্ষ লক্ষ কল কারখানা নিরন্তর চলিতেছে, ও রাশি রাশি পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে তাহা একবার স্মরণ কর, সমুদ্র বক্ষে যে সকল অর্ণবতরি ঐ সকল পণ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতেছে তাহা চিন্তা কর, যে সকল বাষ্পীয় যান নিরন্তর পণ্য দ্রব্য বহন করিতেছে তাহা একবার মনে কর, ভাবিতে ভাবিতে কি অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক ছবি

চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়! কিন্তু এই সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে, যাহা মানব সৃষ্টি করিয়াছে? এ কথা কি সত্য নহে, মানব এক পরমাণুও সৃষ্টি করে নাই। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, যে শক্তি হইতে জগৎ প্রসূত ও যাহার দ্বারা জগৎ বিধৃত, তাহা অক্ষয়,অর্থাৎ তাহার এক কণিকাও বৃদ্ধি হয় না, বা এক কণিকাও ধ্বংস হয় না। সুতরাং মানব এই সম্পদ ঐশ্বর্য্যের এক কণিকাও সৃষ্টি করে নাই। মানব কেবল বনের কাষ্ঠ সহরে আনিয়াছে, খনির ধাতু উপরে তুলিয়াছে, ভূমির মৃত্তিকা ইষ্টকাকারে পরিণত করিয়াছে, এক স্থানের দ্রব্য আর একস্থানে লইয়াছে, এক আকারের পদার্থকে আর এক আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, এই মাত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জগতের ধন ধান্য মানুষকে দেওয়া হইয়াছে, মানুষ কেবল ভোগ করিয়াছে, এই মাত্র মানুষের অধিকার।

সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যে কথা সত্য জ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধেও কি সে কথা সত্য নয়? সম্পদ ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির ন্যায় সভ্য জগতের জ্ঞান ও বিদ্যার বৃদ্ধি দেখিয়াও অবাক্ হইতে হয়। আদিম বর্ব্বর মানুষের জ্ঞানের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান সভ্য মানুষের জ্ঞানের অবস্থার তুলনা করিলে কি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় না? আদিম মানব সামান্য শীতাতপ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত না; সভ্য মানব জ্ঞানবলে যে আত্মরক্ষাতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু প্রকৃতিরাজ্যের অতীব গূঢ়তত্ত্ব সকল জানিয়া প্রকৃতির শক্তি সকলের উপরে আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যদ্ভুত জ্ঞানের বিকাশের কতটুকু মানবের স্বরচিত? মানব জ্ঞানের এক কণিকাও সৃষ্টি করে নাই। জগৎ ও আত্মা এই উভয় মহাগ্রন্থ চিরদিন মানবের চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে; এই উভয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারাই মানুষ সমুদায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা ও আত্মদর্শনের দ্বারা মানুষ যে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই মাল মসলা দিয়াই মানবের জ্ঞানের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-জনিত অথবা আত্মদর্শন-জনিত জ্ঞানের অধিকাংশের উপরে মানুষের হাত নাই। আমরা সে সকল জ্ঞান ইচ্ছা করিয়া লাভ করি না, তাহা আমাদিগকে দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেই, সুনীল

আকাশ ও তরুলতার স্নিগ্ধ হরিৎকান্তি দর্শন করি। কিন্তু আমরা কি সে জ্ঞান ইচ্ছা করিয়া আনয়ন করি? আকাশ কেন নীলবর্ণ দেখায়? তরুলতা কেন হরিদ্বর্ণ দেখায়? তাহার উপরে কি আমাদের কোনও হাত আছে? এইরূপ চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। আবার যাহা ইচ্ছাধীন তাহার উৎপত্তি ইচ্ছাধীন হইলেও তাহার স্বরূপ ইচ্ছাধীন নহে। আমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহা পাইয়াছি, এবং তাহারই সংযোগ বিয়োগ দ্বারা আপনাদের উন্নতি-সাধন করিতেছি ও সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেছি, এইমাত্র।

লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ পরমার্থ জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ। পরমার্থ জ্ঞান আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহা তাঁহার দান। তিনি আমাদিগকে যাহা দেন, আমরা তাহাই পাই, তিনি দাতা, আমরা ভোক্তা। তিনি আমাদিগের আত্মাতে আত্ম-স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন, আমরা তাহা হৃদয়ে ধারণ করি, সম্ভোগ করি ও তাহাকে জীবনের অন্নপানে পরিণত করি। ব্রহ্মার কাজ তিনি করেন, অর্থাৎ তিনি সত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা—মানব বিষ্ণুর কাজ করে, অর্থাৎ মানব সত্যের রক্ষক ও সাধক। অতএব একাধারে দেব ও মানব, এইরূপ ভাবে বাস করিতেছেন, একজন দিতেছেন অপরে ভোগ করিতেছেন। সমগ্রভাবে ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও একথা বলা যায়, যে কিছু সত্য লাভ করিয়া মানুষ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা তিনি দিয়াছেন ও মানব ভোগ করিয়াছে; মানব সংযোগ বিয়োগদ্বারা তাহাকে নিজ কার্য্য সাধনের উপযোগী করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে প্রশ্ন হইতে পারে, একাধারে দেব ও মানব কিভাবে বাস করিতেছেন? এক দেহে কি দুই আত্মা থাকিতে পারে? এই সম্বন্ধ যে কিরূপ তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন দুই জনে সখ্য-ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যেমন দেহ-কোষে আত্মা অধিষ্ঠিত, তেমনি আত্মকোষে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। বাস্তবিক এই তত্ত্ব প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। এইমাত্র জানি যে, তিনি আত্মাতে সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন ও ওতপ্রোতভাবে বাস করিতেছেন।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ।*

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কিমহং নেতামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো, যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

—উপনিষদ্।

অর্থ—মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ যদি বিত্তেতে পরিপূর্ণা এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে, ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। মৈত্রেয়ী বলিলেন,—"যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

But seek ye first the Kingdom of God and his righteousness; and all these things shall be added unto you—Bible, Matthew. Chap VI. Vers 33.

অর্থ—কিন্তু তোমরা সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ও তাঁহার সত্য-বিধিকে অন্বেষণ কর, জগতের এ সকল সম্পত্তি আপনা হইতেই পাইবে।—(অর্থাৎ এ সকলের জন্য চিন্তা করিও না।)

নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলেই উক্ত উভয় উপদেশের তাৎপর্য্য যে একই তাহা অনুভব করিতে পারা যাইবে। উপনিষদে ঋষিগণ যাহাকে অমৃতত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাইবেলে যীশু তাহাকেই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। প্রথম বিবেচ্য এই অমৃতত্ব কাহাকে

* ১৮৯৬, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

বলে ? দেখা যাউক উপনিষদে অমৃতত্বের কিরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদের স্থানান্তরে ঋষিগণ বলিয়াছেন :—

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং ॥

অর্থ—যখন হৃদয়ের বন্ধন সকল ছিন্ন হয়, তখন মানব অমৃতত্ব লাভ করে, সংক্ষেপে অমৃতত্বের এই লক্ষণ বুঝিবে।"

তবে হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই অমৃতত্ব। কিন্তু বন্ধন শব্দ কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে ? যে চলিতে চায়, অগ্রসর হইতে চায়, কোথাও উঠিতে চায়, সেই ব্যক্তিই বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া মনে করে। যে চলিতে চায় না, কোথাও যাইতে চায় না, আপনার অবস্থাতে তৃপ্ত, বন্ধন তাহার পক্ষে বন্ধন নয়। আমরা সংসারে প্রতিনিয়ত ইহা লক্ষ্য করিতেছি। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। চীনদেশের সম্রাটগণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কারাবাসীদিগকে কারামুক্ত করিবার প্রথা আছে। একবার একজন চীন সম্রাট সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কারাবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে একজন জরাজীর্ণ অন্ধ-প্রায় দরিদ্র লোক আসিয়া পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইবার জন্য আবেদন করিল। সে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর ঐ কারাগারে বাস করিয়াছে, চল্লিশ বৎসর একটী অন্ধকার ঘরে থাকিয়াছে, এখন তাহার চক্ষের জ্যোতি হ্রাস হইয়াছে, সে আর উৎকট সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না ; সংসারে তাহার আত্মীয় স্বজন যে দুই একজন ছিল তাহারা এজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে ; পূর্ব্বে তাহার যে ভবন ছিল এখন তাহার চিহ্ন নাই ; তাহাকে আশ্রয় দিয়া গৃহে লয় এমন কেহ নাই ; সে কারামুক্ত হইয়া কয়েক দিন পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছে, এবং আশ্রয়হীন, গৃহহীন ও বন্ধুহীন অবস্থাতে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছে ; এখন তাহার প্রার্থনা যে অনুকম্পা করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তাহাকে ঐ কারাগারে, সেই অন্ধকার গৃহটীতে, থাকিতে দেওয়া হউক। এ ব্যক্তির পক্ষে কারাবন্ধন ত বন্ধন নয়। তেমনি যে ব্যক্তি জীবনের নিম্নভূমিতে থাকিয়াই সন্তুষ্ট, উন্নতভূমির কথা যে জানে না, সেখানে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা যাহার নাই, সে আপনার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়াই অনুভব করে না। মুমুক্ষু

আত্মাই বন্ধন অনুভব করিয়া থাকে। যে পক্ষী উড়িতে জানে ও উড়িতে চায় সেই আপনার পক্ষপুটের রজ্জুকে বন্ধন বলিয়া বোধ করে। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, জীবনের সে উন্নত ভূমি কি, যাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋষিগণ অমৃতত্ব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন? সে উন্নতভূমি ও যীশুর নির্দ্দিষ্ট স্বর্গরাজ্য একই। যীশুও যখন স্বর্গরাজ্যের কথা কহিয়াছেন, তখন মানবকে জীবনের নিম্নভূমি হইতে উঠিয়া উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য এই, যে ধর্ম্মজগত ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বদা শাসিত, তাহাতে প্রবেশ করাই স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বা বন্ধন-মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়মের অধীন হওয়া। তবে দেখ, উভয় উপদেশের তাৎপর্য্য একই।

ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্ম্ম-সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই অমৃতত্ব লাভ বা স্বর্গরাজ্যে আরোহণ। অন্য কোনও প্রকার নিকৃষ্ট ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতে নাই। একথা বলিবার কারণ এই, আমরা প্রতিদিন মানব-সমাজে দেখিতেছি যে, মানব নানা প্রকার নিকৃষ্ট ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। যত লোক বাহিরে ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেছে, ও কোন না কোনও প্রকার ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সকলে যদি বিমল-হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবা করিত, তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল! কিন্তু তাহারা সকলে বিমল ভাবে ধর্ম্মের সেবা করে না। চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে, ধর্ম্মের সহিত যাহাদের স্বার্থের যোগ হইয়া গিয়াছে; ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সকলকে তাহারা স্বার্থসাধনের একটা উপায় স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহারা প্রধানতঃ স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতেছে। ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি এই সকল লোকের অতিশয় দৃষ্টি, পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা অতিশয় ব্যগ্র, এবং সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যের অত্যন্ত বিরোধী। ধর্ম্মের নাম ইহাদের মুখে থাকে, কিন্তু প্রেম ইহাদের অন্তরে থাকে না। সমুদায় তীর্থস্থানের পাণ্ডাদিগের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত লোক। কোনও তীর্থ

স্থানে পদার্পণ করিয়া দেখ, যে সকল যাত্রী বহুদূর হইতে তীর্থে আসিতেছে ও যে সকল পাণ্ডা সেখানে রহিয়াছে, উভয়ে কত প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে! একজন দরিদ্র লোক হয় ত দশ বৎসরের সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া পাঁচ শত ক্রোশ হইতে দেবদর্শনের মানসে আসিয়াছে; দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার চক্ষে জলধারা বহিতেছে; আর ও দিকে পাণ্ডাগণ তাহাকে লইয়া ঠেলাঠেলি, মারামারি, কৌতুক করিতেছে, নিজেরা তাহাকে কি প্রকারে বিধিমতে দোহন করিবে তাহার পন্থা দেখিতেছে। তাহাদের মনে যে নিষ্ঠা ভক্তির কিছুমাত্র আছে এরূপ বোধ হয় না। যীশু যে ফ্যারিসী ও স্যাডুসীদিগের প্রতি ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিতেন, তাহারাও এই শ্রেণীর লোক ছিল; এবং ইহারাই দলবদ্ধ হইয়া যীশুকে হত্যা করিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ কোনও সমাজে যখন জ্ঞান ও সভ্যতাবিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তারতম্য ঘটে, তখন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাতে বিশ্বাস না করিয়াও কেবল লোকরক্ষার্থ তাহাতে যোগ দিয়া থাকে। তাঁহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যেন শিক্ষিত ও জ্ঞানীদিগের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, অজ্ঞ সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জন্যই প্রয়োজন। জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের সেবা না করিলে পাছে অজ্ঞেরাও ধর্ম্মের সেবা না করে, এই জন্য জ্ঞানিগণের পক্ষে বাহিরে ধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে গীতাতে এই যুক্তি কেমন পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
শঙ্করস্থ চ কর্ত্তা স্থামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

অর্থ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি যে বিধির অনুগত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে। হে পার্থ, এ তিন ভুবনে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই, এমন কিছু অপ্রাপ্ত বিষয় নাই, যাহা আমাকে পাইতে হইবে, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। আমি সতর্কতার সহিত যদি কর্ম্মের আচরণ না করি, তাহা হইলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বথা আমারই পথের অনুসরণ করিবে। আমি কর্ম্ম না করিলে সমুদায় লোক উৎসন্ন যাইবে; বর্ণসঙ্কর ঘটিবে ও সমুদায় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব অজ্ঞেরা কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া যে ভাবে কর্ম্মের আচরণ করে, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত থাকিয়া লোক রক্ষার জন্য সেই ভাবেই কর্ম্মের আচরণ করিবেন; কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতিভেদ ঘটাইবেন না; পরন্তু নিজে অনাসক্তভাবে কর্ম্মের আচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন।"

ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু সমাজে বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাহারা নিজে ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাতে বিশ্বাস না করিয়াও কেবলমাত্র লোক রক্ষার আশয়ে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই যে, ঐ সকল দেশের উন্নতি ও সভ্যতার সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন শিক্ষিত দলের মধ্যে থাকিতেন, তখন পরস্পরে অজ্ঞ প্রজাকুলের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মাচরণকে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারাই দেব মন্দিরে গিয়া দেবমূর্ত্তির সমক্ষে প্রণত হইতেন, এবং ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সকল পালন করিতেন। তাঁহাদের মনে এই ভাব ছিল যে ধর্ম্মের ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা অজ্ঞ প্রজাপুঞ্জের

পক্ষে ভাল। এইরূপে অপরকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য ধর্ম্মাচরণ করার মধ্যে যে কোনও যুক্তি নাই, তাহা বলিতেছি না, তবে এইমাত্র বক্তব্য যে এভাব নিকৃষ্ট, ধর্ম্মকে এপ্রকার ভাবে সেবা করিলে ধর্ম্মের অপমান করা হয়। অনেক কাজ মানুষ পরোপকার বুদ্ধিতে করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মটা পরোপকার বুদ্ধিতে করা ভাল নয়। যাহা আত্মার অন্ন পান, যাহা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহা পরোপকার বুদ্ধিতে করিলে তাহার মূল্য লঘু করা হয়।

বর্ত্তমান সভ্য সমাজে মানুষ আর এক ভাবে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। সভ্য সমাজে যেমন সকল বিষয়েই সুন্দর অসুন্দর বলিয়া একটা মতামত আছে, তেমনি যেন মানব-জীবন সম্বন্ধেও সুন্দর অসুন্দর বলিয়া একটা মতামত আছে। সুনিয়মিত সুশৃঙ্খল জীবন দেখিতে সুন্দর, বিশৃঙ্খল জীবন দেখিতে কদর্য্য। ভদ্র সমাজের রীতির মধ্যে থাকিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এমন কি সচরাচর লোকে যাহাকে নীতি-বিগর্হিত কার্য্য বলে তাহাও যদি কর, তাহাতে সৌন্দর্য্যের কিছু ব্যাঘাত হয় না। আবার ভদ্র সমাজের রীতির বাহিরে গিয়া যদি একটা ভাল কাজও কর, তবে তাহা অসুন্দর। এইরূপ সভ্য সমাজের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্যের ভাব দাঁড়াইয়াছে, যাহা অনেকের জীবনকে নিয়মিত করিতেছে। তাঁহারা এই জন্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন যে, ইহা জীবনের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। একটা ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা না থাকিলে জীবনটা বিশৃঙ্খল ও কদর্য্য দেখায়। বিশেষতঃ সভ্য সমাজের বড় বড় লোকেরা ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, সুতরাং ওটা সভ্য সমাজের রীতি। এই ভাবেও অনেক লোক ধর্ম্মের সেবা করেন। তাঁহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে এই ভাব দেখা যায়, সপ্তাহে একবার সপরিবারে উপাসনা স্থানে গিয়া বসাটা ভাল, বেশ দেখায়। এ রীতিটা বেশ! তাঁহাদের ভাব এতদপেক্ষা অধিক গভীর নহে। ইহাও নিকৃষ্ট ভাব।

এইরূপ চিন্তা করিলে ও মানবমন পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মসাধনের আরও অনেক প্রকার নিকৃষ্ট ভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমাদিগকে হৃদয় পরীক্ষা করিতে হইবে, আমরা এ প্রকার কোনও লঘু ও ক্ষুদ্র ভাবে

ধর্ম্মের সেবা করিতেছি কি না? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অমৃতত্ব লাভের জন্যই ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে। প্রধানতঃ মুক্তি লাভের জন্যই ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইবে। আমরা যে পরমার্থ তত্ত্বের চিন্তা করি বা ঈশ্বরারাধনা করি, তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে তদ্দ্বারা আমরা কোনও প্রকার স্বার্থসাধনে সমর্থ হইব বা জগতের কল্যাণ করিব, কিন্তু তাহার লক্ষ্য এই যে সেই সকল তত্ত্বের ধ্যান করিতে করিতে আমাদের চিত্ত তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া জীবনের নিম্ন ভূমি হইতে উঠিয়া উন্নত ভূমিতে আরোহণ করিবে, এবং ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবে। ইহারই নাম বন্ধন মুক্তি বা অমৃতত্ব। অপরকে শিক্ষা দিবার জন্যই পরমার্থ তত্ত্বের প্রয়োজন এরূপ নহে; কিন্তু তাহার ধ্যানের দ্বারা নিজে তদ্‌ভাবাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন। একটী প্রাচীন দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভাবটী ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈদান্তিকগণ সচরাচর জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির একটী উপমা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন তেলা পোকাই কালে কাঁচপোকা হইয়া থাকে। সে ব্যাপারটী এই, কাঁচপোকা প্রথমে তেলাপোকাকে বন্দী করে; বন্দী করিয়া নিজের বিবর মধ্যে লইয়া যায়; লইয়া গিয়া একেবারে প্রাণে মারে না, কিন্তু বন্দী অবস্থাতে রাখিয়া সর্ব্বদা তাহার মুখের নিকট আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে থাকে। সেই ভয়ে তেলাপোকা বিবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে বার বার কাঁচপোকার ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে তেলাপোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়। সেইরূপ জীবও নিরন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তেলাপোকার কাঁচপোকাত্ব প্রাপ্তির কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও এই দৃষ্টান্তটী আমরা কাজে লাগাইতে পারি। পরমার্থ তত্ত্ব সকল আমাদিগকে এরূপ ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে হৃদয় মন সেই ভাবাপন্ন হয় এবং সমগ্র জীবন তদভিমুখে উন্নত হইতে থাকে। সত্যকে এইরূপে সমগ্র হৃদয়ের সহিত গ্রহণ না করিলে তাহার প্রভাব মানব-জীবনের উপরে ব্যাপ্ত হয় না। জীবনের এই উন্নতি ও বিকাশের চরম ফল অমৃতত্ব লাভ।

ব্রহ্মানন্দ ও ধর্ম্মবল।*

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
উপনিষদ।

অর্থ—" সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কোনও স্থান হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।"

জগতের মহাজনদিগের মহত্ত্ব কোন বিষয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকে অনেক প্রকার দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অলৌকিক ধারণা-শক্তিই তাহাদের মহত্ত্বের প্রমাণ। তাঁহারা যে সময়ে ও যে জাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্ভুতভাবে সেই সময়ের ও সেই জাতির সর্ব্বোচ্চ চিন্তা, সর্ব্বোচ্চ ভাব ও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে আপনাদের অন্তরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁহারা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছিলেন, এই তাঁহাদের মহত্ত্ব। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের এক-প্রবণতাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। এক এক জন মহাজনের জীবনে এক একটী বিশেষ সত্যের বা বিশেষ ভাবের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সত্য বা সেই ভাব তাঁহাদিগকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া থাকিয়াছে; যেন একেবারে গ্রাস করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় সেই সত্যের চিন্তা ভিন্ন তাঁহাদের হৃদয়ে যেন অপর কোনও চিন্তা ছিল না। সেই সত্যেরই ধ্যানে তাঁহারা জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অদ্ভুত প্রেমের শক্তিই তাঁহাদিগকে মহৎ করিয়াছে। মানবের প্রতি অসাধারণ প্রেম ছিল বলিয়াই মানবের দুঃখ তাঁহাদের প্রাণে এত আঘাত করিয়াছিল, এবং এই প্রেমের গুণেই তাঁহারা শিষ্যগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন তাঁহাদের অলৌকিক ইচ্ছা-শক্তিই

* ১৮৯৬, ১লা মার্চ্চ, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

তাঁহাদের মহত্বের কারণ। কোনও প্রকার বিঘ্নও বাধাতে তাঁহাদের উদ্যমকে ভগ্ন করিতে পারে নাই।

চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, এই সকলপ্রকার মতের মধ্যেই সত্য আছে। প্রথমতঃ, মহাজনগণের যে আশ্চর্য্য ধারণা শক্তি ছিল তাহাতে সন্দেহ কি? ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা শাক্যসিংহ যে সময়ে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশে সে সময়কার সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছিল। য়িহুদী জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যীশু যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেটী একটী বিশেষ সময়। সে সময়ে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা শত শত হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল। যীশু সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষাকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সকল মহাজনেরই জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বৈষ্ণব গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে শত শত হৃদয়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি অতৃপ্তি জন্মিয়া ভক্তির ধর্ম্মের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। চৈতন্যদেব সেই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অভ্যুদিত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাজনগণের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহাদের চিত্তের অদ্ভুত এক-প্রবণতারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধ যে কি নির্ব্বাণ মুক্তির মন্ত্র ধরিলেন, তাহা চিরজীবন তাঁহার জপমালা হইয়া রহিল! যৌবনে যে কথা বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর দিনেও সেই কথা মুখে রহিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে যে দুই চারিটী কথা বলিলেন, তাহাও সেই কথা!—"সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাদের মুক্তি আপনারা সাধন কর।" যীশুর জীবনেও তাহাই। তিনি যে কি স্বর্গরাজ্যের ভাব হৃদয়ে পাইলেন, যে তাহা আর তাঁহাকে ছাড়িল না! সেই নেশাতেই জীবন কাটিয়া গেল! যে দিন লোকে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনও তিনি সেই নেশাতে আছেন,---ভাবিতেছেন স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। এ কি প্রকার বাতুলতা! বাতুলকে পুলিশ প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া লোকে বাতুলালয়ে লইয়া যাইতেছে, সে হয়ত ভাবিতেছে আমি লক্ষ্ণৌএর নবাব আর এই সকল আমার শরীররক্ষক ভৃত্য। ইহা ও কি কতকটা

সেই প্রকার নহে ? "এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই" এই নেশাতে মহম্মদকে এমনি ধরিয়াছিল যে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সেই একই কথা। বহুদিনের সংগ্রামের পর যে দিন মক্কা নগর জয় করিয়া মক্কাতে প্রবেশ করিলেন, সে দিন সেই জয়ের মুহূর্ত্তে অপর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল না। যাহারা এতদিন তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছে ও যাহারা এক সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তখন তাহাদের প্রতি বৈর নির্য্যাতন করিবার বুদ্ধি আসিল না; অথবা মক্কার সম্পদ ঐশ্বর্য্য অধিকার করিবার ইচ্ছা হইল না; কিন্তু তিনি একেবারে কাবামন্দিরের সন্নিকটে গিয়া এক ব্যক্তিকে উন্নত প্রসাদোপরি তুলিয়া দিলেন; এবং বলিলেন,"তোমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে সেই সমগ্র শক্তির সহিত বল,—"মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর, এক সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের দিনে যে কথা, সম্পদের দিনেও সেই কথা। যে পীড়াতে মহম্মদের জীবন শেষ হইল, সেই শেষ পীড়ার সময়েও তিনি শিষ্যগণের স্কন্ধে ভর করিয়া এই কথা বলিতে উপাসনা মন্দিরে গিয়াছিলেন, যে "এক সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" এইরূপে সকল মহাজনেরই জীবনে অত্যাশ্চর্য্য চিত্তের এক-প্রবণতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয়তঃ,—তাঁহাদের প্রেমের শক্তি অদ্ভুত ছিল। ইহাঁরা সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়া এদেশীয় যোগীদিগের ন্যায় আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না কেন ? নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়াও মানবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন কেন ? বুদ্ধ যে নিরঞ্জন নদীর তীরে সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেইখানেই কি জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন না ? কে তাঁহাকে সেই নির্জ্জন হইতে সজনে যাইতে বাধ্য করিল ? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন—নর-প্রেম। মানবের প্রতি তাঁহাদের এতই প্রেম ছিল যে তাঁহারা সে জন্য জীবন দেওয়াকেও ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেন না। যেমন সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের প্রেম ছিল, তেমনি যাহারা তাঁহাদের নিকটে আসিত, তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিত, তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, তাহারাও তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রীতি সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইত। এই প্রেমেরই গুণে তাঁহারা শিষ্যগণের প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই

তাঁহাদিগের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত এরূপ কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ,—ইচ্ছাশক্তিতেও যে তাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধেরত কথাই নাই, তাঁহাকে ইচ্ছাশক্তির অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ মানসিক বল মানুষে আর কখনও দেখা যায় নাই। তাঁহার মানসিক বলের বিষয় চিন্তা করিয়া মনে আয়ত্ত করা যায় না; চিন্তা করিতে গেলে একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অপরাপর মহাজনের জীবনেও আশ্চর্য্য মানসিক বলের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাজনদিগের মহত্বের যে সকল কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন আরও একটী কারণ আছে, যাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং সেই খানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। সেটী তাঁহাদের অদ্ভুত আশার শক্তি। তাঁহারা সকলেই আশার বলে বলী ছিলেন; জগতের ধর্ম্ম নিয়মের প্রতি আশা, নিজেদের প্রতি আশা ও মানবের প্রতি আশা, এই ত্রিবিধ আশা গুণেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম নিয়মের প্রতি এমনি অবিচলিত আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন যে, সত্য ও সাধুতার জয় অনিবার্য্য বলিয়া অনুভব করিতেন। নিজেদের চেষ্টার দ্বারা যে সেই সত্য-রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয়েও নিঃসংশয় ছিলেন, এবং মানব-প্রকৃতি যে ধর্ম্মের অনুকূল তাহাও বিশ্বাস করিতেন; তদ্ভিন্ন কোনও প্রকারেই এরূপ এক-নিষ্ঠতার সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের এই আশার বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যে সকল অবস্থাতে মানুষের আশা করিবার কোনও কারণই থাকে না, চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ যাহা ছিল তাহাও চলিয়া যায়, এবং একাকী সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, সে সকল অবস্থাতেও ইহাদের আশা হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। সকল মহাজনের জীবনেই এই আশা-শীলতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল ছাড়িয়াও যে পঞ্চজন শিষ্য নির্জ্জনের সঙ্গী ছিল, তাহারাও যখন ত্যাগ করিয়া গেল, বুদ্ধের জীবনের সেই মুহূর্ত্তের কথা একবার স্মরণ কর। সেরূপ অবস্থাতে মানব-হৃদয় কি আর আশান্বিত থাকিতে পারে? বজ্র-নির্ম্মিত হৃদয়ও এরূপ সময়ে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এইখানেই বুদ্ধের মহত্ত্ব যে সেরূপ অবস্থাতেও তাঁহার আশা আরও উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। তিনি নূতন প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্ম-সাধনে বসিলেন। একজন ইংরাজী কবি আশার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"আশা যথার্থই আলোকের ন্যায়; যতই অন্ধকার গাঢ় হয়, আলোক যেমন ততই অধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করে, আশাও সেইরূপ বিপদান্ধকার মধ্যে অধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকে।" একথা যদি কাহারও জীবনে সত্য হইয়া থাকে, তবে এই মহাজনদিগের জীবনেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যীশুর জীবনের বিষয়েও চিন্তা কর। যে দিন তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও সে সময়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সেই ঘোর বিপদের সময় তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। এমন কি তাঁহার সর্ব্বপ্রিয় শিষ্য পিটারও ও প্রাণভয়ে তাঁহাকে অস্বীকার করিলেন। যদি যীশুর জীবনে কোনও দিন, কোনও মুহূর্ত্তে, নিরাশ হইবার কারণ ঘটিয়া থাকে, এই দিন, এই মুহূর্ত্তে তাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তথাপি দেখ, তাঁহার কেমন আশা-শীলতা, তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশা করিতেছেন যে স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আসিবেই আসিবে।

এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সত্য-রাজ্যের প্রতি আশা, তেমনি নিজেদের প্রতি আশা। এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেদের প্রতি আশা স্খলিত হইলে, কখনই এত বিপদের মধ্যে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিতেন না। আপনার প্রতি আশা না থাকিলে এতটা স্বাবলম্বন শক্তি মানব চরিত্রে আসে না।

তৃতীয়তঃ, মানবের প্রতি আশাও অসাধারণ ছিল। এই গুণেই তাঁহারা জগতের পাপী তাপী সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণ মানুষেরা যে সকল লোকের চরিত্রে আশা করিবার মত কিছুই দেখিত না, যাহাদিগকে দেখিয়া তাহারা অবজ্ঞা করিত ও মনে ভাবিত ইহাদিগের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এই সকল মহাজনগণ তাহাদের চরিত্রে এমন কিছু দেখিতে পাইতেন যাহাতে তাঁহারা তাহাদের উপরে আশা স্থাপন করিতেন। তাহারা অপর সকল লোকের নিকটে গেলে হয়ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টি দেখিত ও অবজ্ঞাসূচক ভাষা শুনিত, এই সকল মহাজনের নিকটে আসিলে আশাপূর্ণ প্রেম-হস্তের সুকোমল স্পর্শ লাভ করিত, অমনি

তাঁহাদের হৃদয়ের সদ্ভাব সকল ফুটিয়া উঠিত। এমন কি, এই সকল ব্যক্তি নিজেরা আপনাদিগকে যতটা শ্রদ্ধা করিত না, ও নিজেদের প্রতি যতটা আশা রাখিত না, মহাজনগণ তাহা করিতেন ও ততটা আশা রাখিতেন, ইহাতেই তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া মানব-হৃদয়ের সমুদায় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও সমুদায় গূঢ় সাধুতার শক্তি জাগিয়া উঠিত। ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের আকর্ষণের প্রধান কারণ। যেখানে আশা সেই খানেই সাহস; যেখানে সাহস সেই খানেই দুর্ব্বল আত্মার আকর্ষণ। ঝটিকা মধ্যে পতিত হইলে মানব যেমন স্বভাবতঃ সুদৃঢ়-নির্ম্মিত সৌধতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ জীবনের পাপ তাপের মধ্যে দুর্ব্বল মানব স্বভাবতঃ বলবান ও সাহসী পুরুষের আশ্রয়ে থাকিতে চায়? যুদ্ধক্ষেত্রে যে সেনাপতি আপনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় দৃষ্টি দ্বারা ও উৎসাহজনক বাক্যের দ্বারা সৈনিকগণের সংশয়াকুল চিত্তে সাহসের সঞ্চার করিতে পারেন, সৈনিকগণ যেমন তাহারই নিশানের নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে ভাল বাসে, তেমনি জীবন সংগ্রামে যে ধর্ম্মবীর "মা ভৈ" রব শুনাইতে পারেন, তাঁহারই দিকে সাধারণ মানবের চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এই অলৌকিক সাহসের গুণেই মানবমনের উপর মহাজনগণের এই শক্তি।

কিন্তু এই আশাশীলতা ও এই সাহসের মূল কোথায়? সাধুগণ কি কেবলমাত্র আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া এইরূপ আশাশীল ও সাহসী হইয়াছিলেন? তাহা নহে, আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিলে তাঁহারা কখনই এরূপ অদম্য সাহস লাভ করিতে পারিতেন না। বরং এই কথা বলিলেই ঠিক বলা হয় যে, নিজেদের প্রতি-পূর্ণ নির্ভর ছিল না বলিয়াই তাঁহারা এতদূর সাহসী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজের প্রতি যে আশা ছিল, তাহাও জগতের ধর্ম্মনিয়মের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের ফলমাত্র। তাঁহারা দেখিতেন তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তির পশ্চাতে ধর্ম্মের অবিনশ্বর ও অদম্য শক্তি রহিয়াছে; এই কারণেই তাঁহারা সত্যের বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তাহারা সত্যকে ও ধর্ম্মকে সেই অনন্ত অবিনাশী ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত দেখিতেন, এই জন্যই তাঁহাদের এত সাহস। সত্য ও ধর্ম্মের চিন্তন ও অনুসরণে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াই ভয় ভাবনা বিরহিত হইতেন। হৃদগত সত্য-বিশ্বাস মানবের আত্মাতে ও চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে;

মানুষ না জানিয়া তাহার অধীন হয়; অজ্ঞাতসারে তাহা হইতে বল প্রাপ্ত হয়। কল্পনা কর, দুই ব্যক্তি রাত্রিকালে রাজপথ দিয়া যাইতেছে। দুই জনেই একাকী চলিয়াছে ; কিন্তু একজন সত্য সত্যই একাকী,সঙ্গে কেহ নাই ; অপর ব্যক্তির পশ্চাতে কিছু দূরে দশজন বন্ধু কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছেন। মনে কর একদল দস্যু উভয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দস্যুদিগকে দেখিয়াই প্রথমোক্ত ব্যক্তি ডাকিতে লাগিলেন ;—"ও রাম, ও হরি, ও গোবিন্দ, তোমরা পিছাইয়া পড়িলে কেন ?" অথচ রাম, হরি বা গোবিন্দ কোথাও নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও যখন দস্যুগণ আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, তখন তিনিও ডাকিতে লাগিলেন, "নরেন! নরেন! তোমরা শীঘ্র এস।" দুই জনেরই ডাক এক প্রকার, কিন্তু এই উভয় আহ্বানের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা একবার চিন্তা কর। যখন দস্যুদল ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত না হইয়া সত্য সত্যই উভয়কে আক্রমণ করিল, তখন উভয়ের প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারা গেল। তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রাণভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"খবর্দ্দার! আমার শরীরে হাত দিও না, তাহা হইলে নিস্তার থাকিবে না।" উভয়ের এই বলের তারতম্যের কারণ কি ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে, যদিও সে একাকী দণ্ডায়মান তাহার পশ্চাতে আর একটা শক্তি রহিয়াছে, যাহা তাহার রক্ষা-বিধানে সমর্থ। এইরূপ মানুষ যখন ধর্ম্মনিয়মে ও সত্যের শক্তিতে প্রকৃত আস্থা স্থাপন করে, তখন তাহারও চিত্তে ঐ প্রকার বলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যতক্ষণ আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস এইরূপ সত্য বিশ্বাসে পরিণত না হয়, যতক্ষণ না তাহা আমাদের হৃদয় মনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের দৈনিক কার্য্য ও চরিত্রের উপরে স্বীয় গূঢ় প্রভাব বিস্তার করে, ততক্ষণ সে বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। অনেকের ঈশ্বর-বিশ্বাস সেই প্রথমোক্ত পথিকের রাম, হরি, গোবিন্দকে আহ্বান করার ন্যায় মুখে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু মনে জানে কেহ কোথাও নাই।

ধর্ম্মকে ব্রহ্মাণ্ড-শক্তির সহিত একীভূত না দেখিলে, তাহা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ঘটনা ও অবস্থায় ক্ষণিক ভাবের উপরে যাহার ভিত্তি, তাহা বায়ু-নিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায়, অদ্য আছে কল্য থাকিবে না। ধর্ম্ম সেরূপ বস্তু নহে।

যে ব্রহ্মসত্তাতে জড় ও চেতন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্ম সেই ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত। প্রকৃত ভাবে ধার্ম্মর চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সেই ব্রহ্মসত্তাতেই প্রবেশ করি, ও সেই ব্রহ্মসত্তারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত হই। এই ব্রহ্মসত্তার সহিত আত্মার যোগ অনুভব করিতে পারা একটা পরমানন্দকর ব্যাপার। জগতের সাধুগণ সেই পরমানন্দেরই উপরে আপনাদের আশাশীলতা ও সাহসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-মান্দ্য।*

Blessed are they which hunger and thirst after righteousness for they shall be filled—Mathew chap. V. Vers 6.

অর্থ—ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরাই সৌভাগ্যবান্ কারণ তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা চরিতার্থ হইবে।

মানুষের অভাবই বস্তুর মূল্য। যাহার জন্য কাহারও কোনও অভাব নাই, সে পদার্থের কোনও মূল্যই নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জনসমাজে মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, মানুষে না চাহিলে তাহাদের কি কোনও মূল্য থাকিত? মানুষের সে সকলের অভাব আছে বলিয়া সে সকল এত মূল্যবান্। পল্লীগ্রামের পথে চলিবার সময়ে পথের উভয় পার্শ্বে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা গুল্ম, তৃণ জঙ্গল দেখিয়া থাকি; কে সে সকল লতা গুল্মের দিকে চাহিয়া দেখে বা তাহাদের নাম ও প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করে? প্রতিদিন আমরা সেই সকল লতা গুল্ম দেখি এবং প্রতিদিনই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু এক দিন আমার গৃহে একটী শিশুর গুরুতর পীড়া উপস্থিত, চিকিৎসক মহাশয় একটী ঔষধ দিয়াছেন, তাহার অনুপানের জন্য একটী বিশেষ গুল্মের পাতার রস চাই। সেই দিন আমি আর এক চক্ষু লইয়া গৃহের বাহির হইয়াছি, সে দিন আর একভাবে সেই সকল লতা ও গুল্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সে দিন আর তাহাদের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধি নাই। সে দিন একটী বিশেষ গুল্মের মূল্য যেন একশত মুদ্রা হইয়াছে। তবে জানিও যে দিন অভাব-বোধ সেই দিনই মূল্য-বোধ।

অভাব-বোধ হইতেই যেমন সকল পদার্থের মূল্য, ক্ষুধাই তেমনি খাদ্য-

* ১৮৯৬ সাল, ৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

বস্তুর মূল্য। যাহার ক্ষুধা নাই তাহার নিকট খাদ্যবস্তুর আদরও নাই। একটী সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। আমাদের এই সহরের আলিপুরস্থ প্রাণি-বাটিকাতে যে সকল ব্যাঘ্র আছে, তাহাদিগকে আমমাংস আহার করিতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন একই সময়ে একই প্রকার মাংস আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের এক প্রকার অরুচি জন্মে। তখন আর তাহারা সেই আম-মাংস আহার করিতে চায় না। ব্যাঘ্রদিগের অরুচি জন্মিলে সময়ে সময়ে তাহাদের খাঁচার মধ্যে একটী জীবন্ত ছাগ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করিবার জন্য মনের যে আগ্রহ, এবং তাহাকে হত করিয়া তাহার কবোষ্ণ রুধির পান করিবার যে আনন্দ, তাহাতে অনেক সময় ব্যাঘ্রদিগের অরুচি সারিয়া যায়। একদিন জানা গেল, একটী ব্যাঘ্রের অরুচি হইয়াছে, সে আর আপনার নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছে না। তখন তাহার খাঁচার মধ্যে একটী জীবন্ত ছাগ ফেলিয়া দেওয়া হইল। সকলেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন যে ব্যাঘ্র এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লম্ফ দিয়া সেই ছাগের উপরে পড়িবে এবং নিমেষের মধ্যে তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার রুধির পানে নিযুক্ত হইবে। ছাগটীও বিপদ সন্নিকট জানিয়া প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ব্যাঘ্রটী ছাগের নিকটে আসিয়া একবার মাত্র তাহার শরীর আঘ্রাণ করিল ও সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তখন সকলে ভাবিলেন, এখন ক্ষুধা নাই, রাত্রিকালে ক্ষুধা হইলে তাহাকে নিহত করিবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ছাগটী নিরাপদে ব্যাঘ্রের শয়নাগারে বাস করিতেছে; ব্যাঘ্র তাহাকে স্পর্শও করে নাই। তখন স্থির হইল, ব্যাঘ্রের কোনও প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মিয়া থাকিবে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ জগতে কোনও পদার্থের জন্য কোনও প্রাণীর আগ্রহের যদি সম্ভবনা থাকে, তবে জীবন্ত ছাগের জন্য ব্যাঘ্রের আগ্রহ আছে। কিন্তু সেই জীবন্ত ছাগকেই ব্যাঘ্র স্পর্শ করিল না। যাহার উপরে মহানন্দে লম্ফ দিয়া পড়িবার কথা, তাহাকে স্পর্শও করিল না। যাহার ক্ষুধা নাই তাহার খাদ্যবস্তুর প্রতি আদরও নাই।

আর একটী গল্প বলি। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টা নগরের কথা সকলেই

শুনিয়াছেন। এই স্পার্টাবাসিগণ, সাহস, শ্রমদক্ষতা ও সমরকুশলতার জন্য ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ। স্পার্টাবাসিগণ আহার করিবার সময় এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ জূষ (black broth) পান করিত, যাহার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচার হইয়াছিল। লোকে বলিত স্পার্টার কৃষ্ণবর্ণ জূষের ন্যায় সুস্বাদু জূষ আর নাই। এইরূপে সেই কৃষ্ণবর্ণ জূষের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া মিশর-দেশীয় একজন রাজার মনে তাহা পান করিয়া দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল। তিনি স্পার্টানগর হইতে একজন সুপরিপক্ব পাচক আনাইলেন। পাচক সমুচিত সতর্কতার সহিত কৃষ্ণবর্ণ জূষ প্রস্তুত করিল। কিন্তু মিশররাজ তাহা মুখে দিয়া উদরস্থ করিতে পারিলেন না; তাহা এতই বিস্বাদ মনে হইল। তখন তিনি পাচককে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই তোমাদের স্পার্টার কৃষ্ণবর্ণ জূষ!" পাচক করযোড়ে কহিল—"মহারাজ! ইহাতে একখানি মসলা পড়ে নাই।" রাজা বলিলেন—"সে কি কথা, আগে কেন বল নাই? যে মসলার প্রয়োজন, তাহা আমি আনাইয়া দিতাম।" পাচক বলিল—"মহারাজ! সে মসলাখানির নাম ক্ষুধা।" ঠিক কথা, যেখানে ক্ষুধা নাই, সেখানে খাদ্য বস্তুর স্বাদও নাই।

ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে খাদ্য বস্তুর জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলেই জানে। এই জন্য যাহারা কুক্কুটের লড়াই খেলিয়া থাকে, তাহারা তৎপূর্ব্বে কুক্কুটগুলিকে দুই একদিন অনাহারে রাখে। ক্ষুধার্ত্ত অবস্থাতে খাদ্য বস্তু যখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল পক্ষী জীবন মরণ পণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই বোধ হয় ঈশ্বরও আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার অন্ন বিলম্বে দিয়া থাকেন। আমাদের পাপের প্রতি যখন ঘৃণা জন্মে এবং আমরা নবজীবন লাভের জন্য ব্যগ্র হই, তখন এমনি মনে হয় যেন এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হয় না! যদি এক লম্ফে নরকের গভীর গর্ত্ত হইতে সপ্তম স্বর্গে উঠা সম্ভব হয়, তবে তাহা আমার পক্ষে ঘটুক। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে, পাপী এক লম্ফে সপ্তম স্বর্গে উঠিতে চাহিলেও ঈশ্বর তাহা তোলেন না। এক মুহূর্ত্তে মন ফিরিতে পারে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তে কেহ স্বর্গের দেবতা হইতে পারে না। পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া সাধনা-সাপেক্ষ, তাহা অনেক দিনের, অনেক পরীক্ষার ও অনেক সংগ্রামের কাজ। মুমুক্ষু আত্মার ধর্ম্ম-ক্ষুধা জন্মিলে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্তুকে ধীরে ধীরে দিয়া আগ্রহকে বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি, যে শারীরিক ক্ষুধামান্দ্যের ন্যায় আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্যও আছে। জগতে সদুপদেশের অপ্রতুল নাই, সাধুদৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, কিন্তু যে ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা নাই, সে ব্যক্তির পক্ষে সে সমুদায় থাকিয়াও নাই। আমাদের কি সময়ে সময়ে ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে না? কত ঋষি মুনির, কত সাধু সজ্জনের মহান উপদেশ সকল কি অনেক সময় আমাদের নিকট ব্যর্থ যাইতেছে না? উপনিষদকার ঋষিগণ অথবা ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ যদি আজ স্বর্গধাম হইতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে কি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন না— "আমরাত তোমাদের জন্য উত্তম সন্দেশ ভিয়ান করিয়াছিলাম, তোমাদের ক্ষুধা নাই, সে জন্য তাহার মূল্য বুঝিতে পারিলে না?" হায় হায়! আমাদের অনেকের প্রতি তাঁহাদের এই কথা খাটে।

এখন প্রশ্ন এই, এ প্রকার আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হইবার কারণ কি? ইহার অনেক প্রকার কারণ আছে। প্রথম কারণ জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতা। মানুষের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারেই তাহার জীবনের উন্নতি হইয়া থাকে। চাঁদে আঘাত করিবার জন্য যদি কেহ ঢিল ছোড়ে তবে তাহার ঢিল অন্ততঃ দুই শত হাতও উঠে, কিন্তু আমাদের এই মন্দিরের, ঐ স্তম্ভের মস্তকে প্রহার করা যাহার লক্ষ্য তাহার চেষ্টাও সেই পরিমাণ হয়। যে ব্যক্তি মনে করিতেছে, জনসমাজে থাকিয়া অধিক ধর্ম্ম আর কি করিব, অমনি চলনসই একটু ধর্ম্ম থাকিলেই হয়, তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় কারণ দৈনিক উপাসনার অভ্যাসের অভাব। অনেকে দৈনিক উপাসনার অভ্যাস রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁহারা মনে করেন, দৈনিক-উপাসনার জন্য একটা স্থান বা সময় রাখিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময় দেখা যায়, এরূপ দৈনিক উপাসনা একটা শুষ্ক ও নীরস নিয়ম-রক্ষার মত হইয়া পড়ে। আমাদের দৈনিক উপাসনা যে

প্রতিদিন সরস হয় না, তাহা আমি জানি ; এবং এক এক সময়ে এই নিয়ম রক্ষা করা যে ভার-স্বরূপ হয়, তাহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এ নিয়মটা রক্ষা করা বিধেয়। কারণ দশদিন নীরস হইতেছে দশদিন ত সরস হইতে পারে, দশদিন ত এই দ্বার দিয়া ব্রহ্মকৃপা প্রচুর পরিমাণে তোমার হৃদয়ে আসিতে পারে। তুমি দ্বারটা বন্ধ কর কেন ? যাঁহারা কখনও বসন্তকালে বা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পঞ্জাব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে এক একটী প্রকাণ্ড নদী শুষ্ক বিশুষ্ক ও শীর্ণদেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দুই মাইল ব্যাপিয়া বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে। নদীর মধ্যস্থলে দুই চারিহাত পরিসর একটী জলধারা প্রবাহিত ! তাহাও আবার এমনি অগভীর যে একটী শৃগালও অনায়াসে পার হইয়া যাইতেছে। এই শীর্ণকায় নদী দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, এখানকার লোক কি নির্ব্বোধ, এত বড় বৃহৎ পরিসর স্থান ফেলিয়া রাখিয়াছে, কেন ঐ বালুকারাশি ঘিরিয়া পটলের চাষ করে না ? কিন্তু পঞ্জাবের কোনও কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ঐ নদীকে এখন শীর্ণকায় দেখিতেছেন, কিন্তু বর্ষাকালে ঐ নদীতে বন্যা আসে, তখন কাণায় কাণায় জল হয়, এবং নদীতে জল ধরে না। এখন যদি ঐ খাত বন্ধ করি, বন্যার জল কোথা দিয়া প্রবাহিত হইবে ? তাহা হইলে সে জল অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইবে এখানে আর আসিবে না। তাই খাতটা বাহাল রাখিতে হয়। তেমনি আমিও বলি হে ব্রহ্মোপাসক তুমিও খাতটা বাহাল রাখ ; দুদিনের শুষ্কতা দেখিয়া খাতটা বন্ধ করিয়া দিও না ; তাহা হইলে ব্রহ্মকৃপা তোমার হৃদয়-ক্ষেত্র পরিহার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। জীবনে নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা না থাকিলে বিষয় কার্য্যের বহুলতা বৃদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় কারণ দৈনিক জীবনে ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য। অনেকে এমন সকল বিষয় কার্য্যে লিপ্ত আছেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে প্রতিদিন অসত্য আচরণ করিতে হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রথম প্রথম অনেক বাধা দিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সংসারের ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধির সে নিষেধবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, ঈশ্বর দুর্ব্বলের ঐ অপরাধটুকু

গণনা করিবেন না। ঐ একটু একটু অসত্যাচরণও চলিবে এবং ঈশ্বরারাধনাও চলিবে। কিন্তু ফলে তাহা হইল না। ঈশ্বর শাস্তিস্বরূপ ধর্ম্মের ক্ষুধা নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন।

চতুর্থ কারণ, ধর্ম্মবিরোধী সঙ্গ। এমন অনেক উপাসক আছেন যাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন স্থানে ও এমন লোকের সঙ্গে দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে হয়, যেথানে সততই কুৎসিত আলাপ, কুৎসিত আমোদ, বা কুৎসিত ক্রিয়া চলিয়া থাকে। তাঁহারা চক্ষুলজ্জাবশতঃই হউক, বা অন্য কোনও কারণে হউক আপনাদিগকে ঐ সকল সঙ্গ হইতে বিছিন্ন করিতে পারেন না। তাহার ফল এই হয়, তাঁহাদের চিত্ত অল্পে অল্পে মলিন হইতে থাকে; এবং তাঁহাদের হৃদয়ের ধর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। শেষে তাঁহারাও লঘুভাবে কথা কহিতে ও লঘুভাবে চিন্তা করিতে অভ্যাস করেন। তৎপর সাধুসঙ্গ অপেক্ষা এই সঙ্গ ভাল লাগিতে থাকে; এবং শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা পরচর্চ্চাতে অধিক আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ধর্ম্মের ক্ষুধা একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

চিন্তা করিলে আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্যের আরও অনেক প্রকার কারণ নির্ণীত হইতে পারে। এ সকল কারণ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায় এই যে, আমরা এই সকলের দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেথিব এবং ঐ সকল কারণকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিব। সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা বাড়িতেছে কি কমিতেছে। যে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই সকল দিয়া আপনার জীবন পরীক্ষা করুন, দেখুন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হীন হইতেছে কি না, নিত্য উপাসনা করেন কি না, দৈনিক কার্য্য সকলের মধ্যে এমন কিছু আছে কি না যাহাতে আধ্যাত্মিক মলিনতা উৎপাদন করে, তাঁহাকে দিন দিন স্বার্থের জালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইতেছে কি না, এবং এমন সকল সঙ্গীর মধ্যে বাস করিতেছেন কি না যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে আমাদিগকে সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, এবং যদি দেখি আমাদের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তবে যেন তজ্জন্য অনুতাপ করি এবং যে সকল কারণে ঐরূপ হই-

তেছে, সে সকল কারণ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করি। ইহাতে আমাদের হৃদয়ে কিছু বিনয় আসিতে পারে। আমরা সকলেই রোগী, রোগের যাতনায় সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি। আমাদিগের হৃদয়ে কত সময় কত সত্য আসে, আমরা সে সকলকে গ্রহণ করি না। চিন্তা করিলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। জীবনের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কত সত্য লাভ করিলাম, কত জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম, কত উপদেশ শুনিলাম, কিন্তু জীবনে সে উন্নতি দেখা গেল না। এই সকল যখন চিন্তা করি তখন মনে হয়, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য এই সকল উপদেশ বন্ধ করা যাউক, এবং যাহা শুনিয়াছি সেই সকল লইয়া কিছুদিন রোমন্থন করা যাউক, পশুরা যেমন রোমন্থন করে, ইচ্ছা হয় আমরাও সেইরূপ রোমন্থন করি। বালকেরা যে প্রথম পুস্তক পাঠ করে, তাহা যখন খুলি দেখি তাহার মধ্যে কত সত্য কত নীতি রহিয়াছে; তাহার একটীও যদি কেহ সাধন করিতে পারেন তবে তিনি ধর্ম্মিক হইয়া যান। একবার সকলে অনুতাপ করুন, অনুতাপ না করিয়া, ভগবানের চরণে মাথা না রাখিয়া আজ কেহ এখান হইতে চলিয়া যাইবেন না। আমাদের সকলকে মহা ব্যাধিতে ধরিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের নিকটে কত সত্য রহিয়াছে, কত সাধু সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না। কত ঈষা, কত মুষা, কত বুদ্ধ, কত মহম্মদ আমাদের হৃদয়দ্বারে সর্ব্বদা আসিতেছেন, কিন্তু হায় হায়! ঐ পশুশালার বাঘ যেমন ছাগশিশুকে স্পর্শ করিল না, শুঁকিয়া চলিয়া গেল, আমরাও তেমনি ঐ সকল মহাজনকে একবার স্পর্শও করি না; শুঁকিয়া চলিয়া যাই। যতদিন আমাদের এই ব্যাধি দূর না হইবে ততদিন আমাদের অপরাধ বাড়িবে, কমিবে না; এবং আমরা ধর্ম্মের খোসা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আসল জিনিস লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই ভাব দূর হয় এবং আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দিন দিন বৃদ্ধি হয়।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।*

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

অর্থ—তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর।

তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা কর। তপস্যা শব্দের অর্থ কি? তপস্যা বলিলে এদেশে সচরাচর এই অর্থ বুঝায় যে, ইষ্ট দেবতার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত শরীর ও মনকে কঠিন নিগ্রহ করা। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পার্ব্বতী শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিলেন; অর্জ্জুন ইন্দ্রের ও শিবের আরাধনার্থ ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা করিলেন; ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিলেন; ইত্যাদি যত পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে, সর্ব্বত্রই তপস্যার অর্থ একই;—ইষ্টদেবতার প্রসাদনের জন্য শরীর মনের নিগ্রহ করা। তপস্যার এই ভাব অদ্যাপি এদেশীয় সাধকগণের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই কৃচ্ছ্র সাধনের ভাব এক সময়ে এদেশে প্রবল ছিল, এখন আর নাই, এরূপ নহে। এখনও এদেশের নানা স্থানে হিন্দুসাধক-দিগকে এই প্রকার কঠোর তপস্যার পথ অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এদেশের তীর্থস্থান সকলে পরিভ্রমণ করিলে এখনও দেখা যায়, হয়ত কেহ দশ বৎসর বা বিশ বৎসর ধরিয়া ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া রহিয়াছেন; কেহ বা চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া পঞ্চতপা হইতেছেন; কেহবা লৌহশলাকাময় শয্যাতে শয়ন করিয়া দিবারাত্রি যাপন করিতেছেন; ইহাদের কঠোর সাধনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। ধর্ম্মার্থে এদেশের নরনারী যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে চিত্ত বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যায়। একবার একজন লোক ইষ্ট-

* ১৮৯৬ সাল, ১৫ই মার্চ্চ, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

দেবতার প্রসাদনার্থ এই ব্রত লইয়াছিলেন, যে হরিদ্বার হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমির দৈর্ঘ্যটা নিজের শরীর দ্বারা মাপিয়া মাপিয়া যাইবেন। তিনি নয় বৎসরে শুইয়া শুইয়া এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহারা সকলে তপস্যা বোধেই এই সকল কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। যাঁহারা এই প্রকার তপস্যা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা সচরাচর জনসমাজ হইতে অবসৃত হইয়া এই সকল তপস্যা করিয়াছেন। কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ জনসমাজের মধ্যে থাকিয়াও আর এক প্রকার তপস্যা করিয়া থাকেন, আমরা অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করি না। শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারা, বা কোনও প্রকার শারীরিক ক্লেশে অভিভূত না হওয়া, মানসিক বলের কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং এ সাধনে যাঁহারা কৃতকার্য্য হন তাঁহারাও যে প্রশংসার যোগ্য তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতিকে শৃঙ্খলার অধীন করা, অলস ও সুখপ্রিয় চিত্তকে সদানুষ্ঠানে রত করা, অচঞ্চল ভাবে জীবনের ক্ষুদ্র ও মহৎ তাবত কর্ত্তব্য কার্য্যকে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা, এবং সর্ব্ব বিষয়ে ও সর্ব্ব কার্য্যে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করা—ইহাও সামান্য মানসিক বলের কর্ম্ম নহে। জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বা ঈশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রবৃত্তিকুল ও আমাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আমাদিগকে সুস্থির হইতে দেয় না। চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করিতে চায়। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করা ও চঞ্চল চিত্তকে সংযত রাখা কি সামান্য তপস্যার কর্ম্ম ? অতি প্রাচীন কাল হইতেই সকল শ্রেণীর সাধকগণ এই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করাকে দুষ্কর বলিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছেন। ভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥

অর্থ—"হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতঃ অতিশয় চঞ্চল ও অতিশয় অনবহিত, আমি তাহার নিগ্রহকে বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় দুষ্কর বলিয়া মনে করি।" ইহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিতেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥

অর্থ—"হে মহাবাহো ! মন যে স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে সংযত করা যায়।"

ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এবিষয়ে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে :—পুরাকালে বুদ্ধ যখন শ্রবস্তি নগরের সন্নিহিত জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন একজন ধনী গৃহপতি তাঁহার নিকট আসিল ; এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিল,—"হে জগতের বন্দনীয় গুরো ! আমি যখন উপাসনা বা অন্য কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন কোনও না কোন স্বার্থ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে ও আমার মনের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।" শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল, যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে রাজার হাতীর মাহুত ছিল। শাক্যসিংহ বলিলেন,—"যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেই-রূপে আপনাকেও বশ করিবে।" ইহাও সেই ভগবদ্গীতার কথা—অভ্যাস দ্বারা আপনাকে বশীভূত কর। হস্তীকে বশীভূত করার ন্যায় "অভ্যাসের" কার্য্যকারিতার উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। হস্তীকে পোষ মানান কিরূপ দুষ্কর, শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা দেখি হস্তী প্রকাণ্ড বলবান জন্তু হইয়াও ক্ষুদ্র মানবের বশীভূত রহিয়াছে ! "বোস" বলিলে বসিতেছে, "ওঠ" বলিলে উঠিতেছে ! সমুদয় আদেশের অর্থ গ্রহণ করিতেছে, ও তাহা সম্পাদন করিতেছে ! কিন্তু সেই বাধ্যতার পশ্চাতে যে কত দিনের সাধনা রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাই। বন্য অবস্থাতে তাহাকে ধরিয়া কত দিন দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে, কতদিন অনাহারে যাতনা ভোগ করাইতে হই-য়াছে, একটী শব্দ কত সহস্র বার শুনাইতে হইয়াছে, এবং তদনুসারে কার্য্য করাইবার জন্য তাহার শরীরকে কত ব্যথা দিতে হইয়াছে। হয়ত সে কতবার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে, কত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে,

আবার ধরিয়া আনিতে হইয়াছে, কত মাহুতকে খঞ্জ করিয়াছে, তবে সে ক্রমে ক্রমে বশীভূত ও আজ্ঞানুগত হইয়াছে।

আমাদের অশাসিত প্রকৃতিও কি কিয়ৎ পরিমাণে অরণ্যচারী মত্ত বারণের ন্যায় নয়? হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষ মানান যেমন দুষ্কর, বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন এক গ্রাস ও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়, সেইরূপ আমাদের মনও কি অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে না? সেই মনকে ধরিয়া বাঁধিয়া ধর্ম্মের অধীন এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করাও তেমনি শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য। উপনিষদ-কার ঋষিগণ মানব-প্রকৃতির এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন—

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥

অর্থ—"যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান ও সংযত-চিত্ত তাহার ইন্দ্রিয় সকল উপযুক্ত সারথির সদশ্বের ন্যায় সর্ব্বদা বশীভূত।

অশ্বকেও বশীভূত করিতে কত সাধনার প্রয়োজন!

যাঁহারা জন সমাজের সহস্র প্রকার চিত্ত বিক্ষেপকারী ঘটনা ও কার্য্যের মধ্যে চিত্তকে ধর্ম্মেরও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুগত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের যে সাধনা, তাহা কি তপস্যা শব্দ-বাচ্য নহে? বরং প্রকৃতভাবে বিচার করিলে ইঁহাদের তপস্যা প্রথমোক্ত তপস্বিগণের তপস্যা অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর বোধ হইবে। এক কোপে সংসারের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দিয়া, প্রলোভনের অতীত স্থানে গিয়া চিত্ত-সংযম সাধন করা তত কঠিন নহে। কিন্তু জন সমাজের সহস্র প্রকার কার্য্য ও প্রলোভনের মধ্যে আপনাকে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার প্রয়াস পাওয়া, আশাও নিরাশার আন্দোলনের মধ্যে আপনার আদর্শকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখা, দিন দিন তিল তিল করিয়া আপনার উচ্ছৃঙ্খল ও সুখপ্রিয় প্রকৃতিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করা, প্রাণপণ যত্নে ও সকল ক্লেশ বহন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সকল সাধন করা অতিশয় কঠিন। আমরা ইহা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। আমাদের কোন্ দিন এমন যায় যেদিন জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছি না বলিয়া শোক করিতে হয় না? অনেক দিন

কি এমন হয় না, যে আমাদের মন ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয়, আর পারি না, বুঝিবা এ পথ আমার জন্ত নহে। আর এ রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না, দূর হোক পলায়ন করি?" আপনাকে শাসনে রাখিতে গিয়াই এই যাতনা; অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে চিন্তা করিলে আবার এই যাতনা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। যে আপনাকে সামলাইতে পারিতেছে না. সে আবার অপরকে কিরূপে সামলাইবে? যখন লোকে বলে ঐ দেখ পরিবার সকল উপাসনা-বিহীন, ধর্ম্মভাব-বিহীন হইয়া যাইতেছে; ঐ দেখ বালক বালিকাগণ ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া পড়িতেছে ও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিতেছে, ঐ দেখ নারীগণ স্বার্থপর ও বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়িতেছে, তখন মন আরও গভীর নিরাশার মধ্যে পতিত হয়। মন বলিতে থাকে এই সকলের উপায় বিধান কি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-শক্তি-বিশিষ্ট লোকের কাজ? এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা কেবল যাতনা বৃদ্ধি করামাত্র, আমি নিজের রোগেই নিজে মরি, অপর রোগীর সংবাদ আর কি লইব? অতএব এ সকল বিষয় আর দেখিব না, ভাবিব না, এ সম্বন্ধে আমার কিছু কর্ত্তব্য থাকিলেও তাহা সাধনের শক্তি নাই,সুতরাং সে বিষয়ে ভাবিবারও প্রয়োজন নাই। ওরা মরে মরুক,ডোবে ডুবুক,আমি যদি পারি আপনি বাঁচিবার প্রয়াস পাই।"

চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে,এরূপ ভাব মূলে সেই চিরন্তন স্বার্থপর সাধনের ভাব, অর্থাৎ সহজ তপস্যাতে ঈশ্বর লাভ করিবার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেমের প্রকৃতি এই, ইহা পরীক্ষাকে ভয় করে না; বিপদে আনন্দিত হয় ও শ্রমকে মিষ্ট জ্ঞান করে। সৈন্যগণ সচরাচর যুদ্ধের সাধারণ নিয়মানুসারে যুদ্ধ করে, কিন্তু কখনও কখনও বিশেষ বিপদে এরূপ হয় যে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শত্রুবৃন্দের গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। অনবরত বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলাগুলি বর্ষণ হইতেছে, আর তন্মধ্যে কতিপয় বীরহৃদয় অকুতোভয়ে সিংহ বিক্রমে শত্রুকুলের অভিমুখে দৌড়িতেছে। ইহাতে কিরূপ সাহস ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয়! তেমনি জীবনের নানা অসুবিধার মধ্যে যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেমের পরিচয়।

অতএব জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যেও একপ্রকার তপস্যা আছে, যাহা ধার্ম্মিকগণ করিয়া থাকেন। এই তপস্যা ব্রহ্মকে জানিবার একটী প্রধান উপায়-স্বরূপ। ঋষিগণ বলিয়াছেন তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জান। এই উক্তির মধ্যে কি গভীর তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ঋষিগণ একথা বলিলেন না, বিচার দ্বারা বা শাস্ত্রালোচনার দ্বারা ব্রহ্মকে জান, কিন্তু বলিলেন যে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জান। ইহার কারণ কি ? চিন্তা করিলেই ইহার কারণ অনুভব করিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান এ দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে নানা যুক্তি ও নানা শাস্ত্রের মত বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তিনি ব্রহ্ম বিদ্যাতে নিপুণ, কিন্তু নিজ আত্মাতে ব্রহ্মস্বরূপের আস্বাদন যিনি করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। যুগে যুগে সাধুগণ একবাক্যে এই কথাই বলিতেছেন যে, চিত্তের পবিত্রতা না হইলে, ব্রহ্মদর্শন অথবা ব্রহ্মের স্বরূপাস্বাদন হয় না। তপস্যার এই মহাগুণ যে, ইহা চিত্তকে স্বার্থ ও সুখাসক্তির নিম্নভূমি হইতে তুলিয়া নিঃস্বার্থতার ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তার উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করে। সেই উচ্চ ভূমির পবিত্র বায়ুই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের অনুকূল। তপস্যার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, প্রবৃত্তি-কুলের উত্তেজনা প্রশান্ত হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল ও আত্ম-শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মকে যিনি জানিতে চাহেন তাঁহার পক্ষে তপস্যা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আর এই একটা সুখের বিষয় যে, এরূপ তপস্যার সুবিধা ও সুযোগ আমাদের সকলের জীবনেই আছে। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার জীবনে প্রলোভন বা পরীক্ষা নাই, বা কর্ত্তব্য কার্য্য কিছু নাই, বা প্রবৃত্তিকুলকে সংযত করিবার প্রয়োজন নাই ? আমরা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি যে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বহু বৎসরের সাধনার কাজ। হাতীকে বশ করা যেমন মাহুতের কঠোর তপস্যার কর্ম্ম, তেমনি আমাদের প্রকৃতিকে ধর্ম্মের অধীন করা বহু বৎসরের শ্রমের কর্ম্ম। সেই শ্রম ও সাধনা কি তপস্যা নহে ? কখনও কখনও কোনও কোনও গায়কের কথা শুনিতে পাই, যাঁহারা বিশ পঁচিশ বৎসর গুরু সন্নিধানে থাকিয়া দিন দিন অনেক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তবে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা

করিয়াছেন। ইহা কি তপস্যা নহে? আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছি, তাহা উপার্জ্জন করিতে কাহাকেও পনর বৎসর কাহাকেওবা বিশ বৎসর প্রতিদিন দশ বার ঘণ্টা বিদ্যা চর্চ্চাতে যাপন করিতে হইয়াছে, ইহা কি তপস্যা নয়? সামান্য লৌকিক বিদ্যালাভের জন্য তপস্যা করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হই নাই; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তপস্যা করিতে কেন পরাঙ্মুখ হইব। ঈশ্বর করুন আমরা যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই শ্রেষ্ঠ তপস্যাতে প্রবৃত্ত থাকিতে পারি।

ভয়ের ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম।*

For thou desirest not sacrifice ; else would I give it ; thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit ; a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise—Psl of David LI. Verses 16&17.

অর্থ—তুমি বলি পাইবার ইচ্ছা রাখ না, নতুবা আমি তাহা দিতাম, ধূপ, দীপ, হোমাদিতেও তুমি তুষ্ট নও ; ভগ্ন আত্মা রূপ বলিই ঈশ্বরের গ্রাহ্য, ভগ্ন ও অনুতাপিত হৃদয়কে হে ঈশ্বর তুমি অবহেলা করিবে না।"

এই বেদী হইতে এ কথার অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে যে, জগতের অধিকাংশ জাতির মধ্যে ভয় হইতেই প্রণতি, স্তুতি, পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইষ্ট দেবতার প্রসাদনার্থই পূজার সৃষ্টি। যে কুপিত, এবং যাহার কোপ হইতে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা, তাহারই প্রসাদনের প্রয়োজন। আদিম বর্ব্বর অবস্থাতে মানবের মনে পূজার এই ভাবই বিদ্যমান ছিল। আদিম মানুষ অনভিজ্ঞ চক্ষু লইয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছে যে,কি এক দুর্জ্জয় শক্তি সেখানে ক্রীড়া করিতেছে, যাহার কার্য্য সকল ত্রাসজনক ও যাহার প্রকোপ অদম্য। মানব স্বভাবতঃই এই শক্তির সমক্ষে নতজানু হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রার্থনা করিয়াছে,—"মা মা হিংসী" আমাদিগকে বিনাশ করিও না। তৎপরেই এই শক্তির প্রসাদন প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছে ; এবং প্রসাদনার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাই আদিম পূজা। কিন্তু ভয় হইতে যে পূজার উৎপত্তি হয়, তাহাতে বলিদানের ভাব সন্নিবিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। কারণ মানুষ আপনার জীবনের ঘটনা দিয়াই বিচার করে। আদিম অবস্থার মনুষ্যগণ দেখিয়াছে, যে যখন কোনও দুর্জ্জয় রাজা বা দস্যু-দলপতি অপর দেশকে আক্রমণ করে, তখন কিছু না লইয়া যায় না। তাহারা যাহা চায়, তাহা না দিতে পার,

* ১৮৯৬ সাল, ২৯শে মার্চ্চ, রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

আর একটা এমন কিছু দেও, যাহাতে তাহাদের সন্তোষসাধন হইতে পারে। বিগত শতাব্দীতে আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামা ছিল। বর্গিগণ যখন আসিত তখন কিছু না লইয়া যাইত না। টাকা দিতে না পার, ক্ষেত্রের শস্য দেও; ক্ষেত্রের শস্য না থাকে, গরু বাছুর দেও; কিছু দিতেই হইবে, নতুবা নিষ্কৃতি নাই। ভয়ের ধর্ম্মেও এই ভাব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশের অপামর সাধারণ সকল লোকেই প্রেতাবেশে বিশ্বাস করিত। বালক বালিকা বা অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের উপরেই এই সকল উপদেবতার বিশেষ দৌরাত্ম্য ছিল। যখন কোনও ব্যক্তি এইরূপে প্রেতাবিষ্ট বা উপদেবতাগ্রস্ত হইত, তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে কিছু না লইয়া যাইবে না। সুতরাং ওঝাগণ আসিয়া উপদেবতাদিগের অনেক সাধ্য সাধনা করিত। বলিত—"ঠাকুর একে ছাড়িয়া দেও, তুমি কি চাও বল ?" অনেক সাধ্য সাধনার পরে একটা কিছু বলির বন্দোবস্তে রফা করিয়া তাহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিত। এইরূপে যেখানেই ধর্ম্মভাবের মধ্যে ভয়ের ভাব প্রধান এবং ইষ্টদেবতার প্রসাদনার্থই পূজা, সেখানেই বলিদানের ব্যবস্থা। ভয়ের ধর্ম্মের ভাবই এই "কিছু দিতে হইবে।" প্রেমের ধর্ম্মের ভাব অন্য প্রকার। প্রেমের ধর্ম্মে বলে—"কিছু হইতে হইবে।"—ভয় বলে "কি দিলে এই দুরন্ত শক্তির হাত হইতে বাচি ?" প্রেম বলে—"আমি কিরূপ হইলে প্রেমাস্পদের সহিত যোগ হইতে পারে ?" জগতের প্রধান প্রধান জাতিদিগের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, ভয়ের ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এই বিপ্লব সংঘটিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে। জগতের যে দুর্জ্জয় শক্তিকে দেখিয়া আদিম অবস্থাতে মানুষ ভয়ভীত হইয়াছে, তাহাকে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা, এই কথা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অনেক যুগ লাগিয়াছে। তৎপূর্ব্বে জগৎকার্য্যের অনেক পর্য্যবেক্ষণের, সেই সকল কার্য্যের ফলাফলের অনেক বিচারের ও বিজ্ঞানের অনেক উন্নতির প্রয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যখন বুঝিয়াছে, যে প্রকৃতির আপাত-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির অন্তরালে কল্যাণবিধান লুক্কায়িত আছে, তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিয়াছে,—"পিতা নোসি!"—"তুমি আমাদের পিতা।"

ভয়ের ধর্ম্ম এইরূপে প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্ব জাতি মধ্যেই যুগে যুগে এরূপ সকল প্রেমিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভয়ের ও বলিদানের ধর্ম্মের অসারতা প্রতীতি করিয়া প্রেমের ধর্ম্মের জন্য উন্মুখ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই এই সকল মহাজনের বিশেষত্ব। যখন দেশের সাধারণ লোক অসার আড়ম্বরপূর্ণ, বলিদানপূর্ণ ভয়ের ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, তখন তাঁহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—"এ সকল অসার অনুষ্ঠানে কি ফল?" বৃদ্ধ য়িহুদী রাজা দায়ুদের সংগীতাবলী হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস মাত্র। এই দীর্ঘনিঃশ্বাস যুগে যুগে অনেক মহাজনের হৃদয় হইতে উঠিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী-সংবাদ নামে একটী পরিচ্ছেদ আছে, তন্মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন:

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে, তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

অর্থ—হে গার্গি যদি কোনও ব্যক্তি সেই অবিনাশী পরম পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর হোম, যাগ, তপস্যাদি করে, সে সমুদায়ের কোনও ফল হয় না, সে সমুদায় বিনষ্ট হয়।"

ইহাও ঐ দীর্ঘ-নিশ্বাস!! হায়! এ অসার যাগ-যজ্ঞ তপস্যাতে প্রয়োজন কি? তাঁহাকে জানা এবং প্রীতি করাই ত সার কথা! ভয়ের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস বার বার মানব-হৃদয় হইতে উঠিয়াছে। সাধুদিগের এই হায় হায় রবের প্রতিধ্বনি সর্ব্বদেশের শাস্ত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। নানক ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে স্বামিন্! জপ, তপ, নিয়ম, শৌচ, সংযম সকলিত করিলাম, প্রাণের মলিনতা গেলনা কেন?" এই ক্ষোভের বাণী কত সাধুর মুখে শুনা গিয়াছে! এই আন্তরিক যাতনা হইতেই প্রেমের ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। প্রেমের ধর্ম্মে প্রবেশের দ্বারেই ভগ্ন-হৃদয়তা। য়িহুদীরাজ দায়ুদ ঠিক বলিয়াছেন। বস্তুটা কি তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দুই জাতীয় ভগ্ন-হৃদয়তা দৃষ্ট হইয়াছে; এক ভগ্ন-হৃদয়তা নিজ পাপের স্মৃতিজনিত; দ্বিতীয়

ভগ্নহৃদয়তা অপরের পাপের স্মৃতি ও প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা-জ্ঞান-জনিত। নিজ পাপের স্মৃতি-জনিত যে ভগ্ন-হৃদয়তা তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, এবং সর্ব্বসাধারণেই তাহা বুঝিতে পারে। সমুদায় প্রেমের ধর্ম্মে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-ধর্ম্মে জগাই মাধাই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে সেণ্ট-পল, ইসলাম ধর্ম্মে ওমর ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে জগাই মাধাই নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে শ্মশানের ঘাটে বাস করিয়া দস্যুতা করিত, আর যে জগাই মাধাই গৌরচন্দ্রের প্রেমে বন্দী হইয়া, হরিনাম লইয়া "দীনের দীন তৃণেরও হীন" হইয়াছিলেন, এই উভয়ে কত প্রভেদ! যে সল নামক যুবা ষ্টিফেনের হত্যাকালে ঘাতকদিগের পরিচ্ছদাদি লইয়া বসিয়াছিল, এবং যে যুবক জেরুসালেম নগরীর পুরোহিতগণের নিকট ভার প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর উৎসাদনার্থ ডামস্কস নগরাভিমুখে যাইতেছিল, সেই যুবকও যে ভগ্ন-হৃদয় পুরুষ যীশুর প্রেমের অনুরোধে বিনীত অন্তরে সর্ব্ববিধ অত্যাচার, নির্যাতন ও উপদ্রব সহ্য করিতেছেন, এ উভয়ে কত প্রভেদ! যে সিংহসমান বিক্রমশালী ওমার সুশাণিত তরবারি করে ধারণ করিয়া স্বীয় ভগিনী ও ভগিনীপতির শিরশ্ছেদনের সংকল্প করিয়া গৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন এবং যিনি অবশেষে বিনয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাঁহাদেরই পদে লুণ্ঠিত হইলেন, এই উভয়ে কত প্রভেদ! হায় হায়! প্রেমের ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অনুতাপে ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে কি করিয়া দিল!

প্রেমের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই অনুতাপকে দেখিতে পাওয়া যায় কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রেমের ধর্ম্ম বলে—"কিছু হইতে হইবে।" প্রেমের স্বভাব এই, ইহাকে যদি হৃদয়কে অধিকার করিতে দেও, তবে ইহা সর্ব্বস্ব হরণ না করিয়া ছাড়ে না। সম্পূর্ণরূপে বাসনার অর্থাৎ স্বার্থপ্রবৃত্তির বিলয় না করাইয়া নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং হৃদয়ে যতক্ষণ প্রেমবিরোধী কিছু থাকে, ততক্ষণ প্রেমিক-হৃদয় যাতনা পাইতে থাকে;—"এটুকু কেন এখনও গেল না, প্রেমাস্পদের সহিত যে পূর্ণ যোগ হইতেছে না। এ কাল শত্রু পাপ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আমার হৃদয়ে আসিল? এ স্বার্থপ্রিয়তা কেন হৃদয়ে রহিল।" এই ভাব হইতেই অনুতাপ-যাতনার উদয় হয়। ভয়ের অনুতাপ হৃদয়ের ও ধর্ম্মজীবনের বাহিরে পড়িয়া থাকে, প্রেমের

ধর্ম্মের এই অনুতাপ হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, যে প্রেমের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভয়ের ধর্ম্ম মানব চরিত্রে অনুতাপের উদয় করিবার পক্ষে অধিক অনুকূল, তাঁহাদের মহা ভ্রান্তি। ভয়ের ধর্ম্মের পক্ষে অনুতাপের উদয় করিবার নিমিত্ত স্বর্গ নরককে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়, প্রেমের ধর্ম্মে স্বর্গ নরকের চিন্তাও মনে আসে না; অথচ তীব্র অনুতাপের উদয় হয়। আমি কেন কাঁদিতেছি; এজন্য নহে যে পাছে নরকে যাই, কিন্তু এই জন্যই যেএই পাপের নিমিত্ত আমার প্রেমাস্পদের সহিত যোগ হইতেছে না।" এই প্রেমিকের ভাষা। এই জন্য এ কথা যথার্থ যে, অনেক সাধককে অনুতাপরূপ দ্বার দিয়া প্রেমের ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হয়। অনুতাপ দীনতাকে আনিয়া দেয়; দীনতা ভক্তিকে আনয়ন করে।

এই প্রেমের ধর্ম্মের দ্বারে আর এক প্রকার ভগ্ন-হৃদয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুতাপের জন্ম নিজকৃত পাপের স্মৃতি হইতে, সে ভগ্ন-হৃদয়তার জন্ম অপরের কৃত পাপের স্মৃতি হইতে। আপাততঃ এ কথা অনেকের পক্ষে অতি বিচিত্র বোধ হইতে পারে। অপরের পাপ স্মরণ করিয়া মানুষের কি এরূপ দুঃখ হইতে পারে যে তাহাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়? ইহা ত সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু প্রেমিক সাধুগণের জীবনে ইহা বার বার দেখা গিয়াছে। তাঁহারা মানব-সমাজকে এত প্রীতি করিতেন যে মানব-সমাজের এক একটী পাপ এক একটী বিষাক্ত বাণের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইত; এবং মানব-সমাজের দুঃখ দুর্গতির চিন্তা তাঁহাদিগকে দিন-রাত্রি শান্তিহীন করিয়া রাখিত। আমাদের হৃদয়ের যেরূপ প্রেমহীন অবস্থা তাহাতে এই বর্ণনাকে আমরা কবিত্বপূর্ণ ও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একবিন্দুও কবিত্ব বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা নাই। প্রত্যেক মহাজনের জীবনেই আমরা দেখিতে পাই যে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে তাঁহারা সুগভীর মনোগ্লানিতে কাল কাটাইতেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের বিষয় এরূপ উক্ত হইয়াছে, যে তিনি এরূপ ঘন বিষাদের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা সে জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদনার্থ নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার

চিত্তের বিষণ্ণতা বা প্রতিজ্ঞার একাগ্রতা বিদূরিত করিতে পারে নাই। প্রশ্ন করি, চিত্তের এই বিষণ্ণতার কারণ কি? তিনি কি একজন পাপিশ্রেষ্ঠ ছিলেন যে নিরন্তর নিজ পাপ স্মরণ করিয়া খিন্ন থাকিতেন? তাহা নহে; সাধারণ জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তিনি এই গভীর বিষাদে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যীশুর ও জীবনে এই দেখি। তিনি নিরন্তর এমনি বিষণ্ণ থাকিতেন যে, কেহ কখনও তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই। এই কারণে তাঁহাকে (man of sorrows) চির বিষণ্ণ মানুষ বলা হইয়াছে। যীশু কি এত বড় দুষ্ক্রিয়াম্বিত পাপী ছিলেন, যে তাঁহার চিত্তে দিন রাত্রি অশান্তি বাস করিত? কখনই নহে। তিনি মানবগণের বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয়দিগের দুর্গতি দেখিয়া সর্ব্বদা শোক করিতেন। মহম্মদের বিষয়ে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি হরা পর্ব্বতের গুহাতে বসিয়া আরবের দুর্দ্দশার বিষয়ে যখন চিন্তা করিতেন, তখন যাতনাতে অভিভূত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অচেতন হইয়া পড়িতেন। অনেক যত্ন করিয়া চৈতন্ত সম্পাদন করিতে হইত। এই যাতনা এক এক সময়ে এত তীব্র হইত যে তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতেন। মহাজনদিগের এই যাতনার কথা স্মরণ করিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এতটা মানব-প্রেম আমাদের হৃদয়ে ধারণ হয় না। যাহাদের জন্ম ইহারা কাঁদিয়া দিন কাটাইয়াছেন, তাহারা নিদ্রিত থাকিয়াছে, ক্ষুদ্র সুখে ডুবিয়া থাকিয়াছে, এবং এই পরম হিতৈষী বন্ধুদিগকেই শত্রুবোধে নির্যাতন করিয়াছে। আর তাহাদেরই পাপতাপের বিষয় ধ্যান করিয়া ইঁহাদের চক্ষে জলধারা বহিয়াছে। এমন প্রেমের দৃষ্টান্ত কেবল মাতৃস্নেহেই দেখিতে পাই! দুর্ব্বৃত্ত সন্তান পাপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন হয়, আর ওদিকে নেত্রজলে জননীর রাত্রিকালের উপাধান সিক্ত হইতে থাকে। আর এমন প্রেম ঈশ্বরেই সম্ভবে। মানুষ যে এই সকল মহাজনকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। ঈশ্বরীয় ভাব বহুল পরিমাণে ইঁহাদের মধ্যে না থাকিলে কি মানবের প্রতি এতটা প্রেম হয়?

যাহা হউক এই অলৌকিক প্রেম হইতেই ইঁহাদের ভগ্ন-হৃদয়তার উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং ভগ্ন-হৃদয়তা হইতেই দীনতা ও সাধন-নিষ্ঠা জাগিয়াছিল;

এবং দীনতাপূর্ণ সাধন-নিষ্ঠা হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমের ধর্ম্মের পথিক যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারা ও এই ভগ্ন-হৃদয়তার পথ দিয়া আসিয়াছেন।

প্রেমের ধর্ম্ম ও ক্রিয়ার ধর্ম্ম।*

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং,
যথা তমোর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

ভাগবত, ১২, স্কন্ধ, ১২, অধ্যায়।

অর্থ—সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে হরণ করিয়া থাকে, অথবা প্রচণ্ড বাত্যা যেরূপ মেঘ রাশিকে অপসারিত করে, সেইরূপ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন যিনি শ্রবণ করেন, ভগবান তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সমুদায় আসক্তিকে অপসারিত করিয়া থাকেন।

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ,
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং॥

ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

অর্থ—গঙ্গার স্রোত যেমন স্বভাবতঃ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত সেইরূপ আমার গুণাবলী শ্রবণ মাত্র যাহার সমগ্র চিত্তের গতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়াছে।

ভাগবত হইতে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত উভয় বচনে ধর্ম্মসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা সংক্ষেপে নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম বচনে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণের ফল এই যে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদায় আসক্তি নিবারণ করেন। দ্বিতীয় বচনে উক্ত হইয়াছে, যে ভগ-

* ১৮৯৬ সাল, ৫ই এপ্রেল রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

বানের গুণানুবাদ শ্রবণ মাত্র যদি মনোগতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তবেই তাহা ভক্তি শব্দে বাচ্য। এই উপদেশের ভিতরকার কথা এই,—ধর্ম্ম বাহিরে নয়, ধর্ম্ম অন্তরে। আত্ম-পুরই ভগবানের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আত্মাতে প্রেম ও ভক্তির অভ্যুদয় করিয়াই তিনি মানবের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। এই মনোগতির পরিবর্ত্তনই ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ, এবং ভক্তিলাভই ধর্ম্মের পূর্ণতা। আমরা একটী বিষয়ের জন্য এতদ্দেশীয় ভক্তি পথাবলম্বিগণের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ। তাঁহারা আমাদিগকে একটী মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। সেটী এই—আমাদের প্রবৃত্তি সকলের বিনাশ বা উচ্ছেদ আবশ্যক নহে। হৃদয় বদলাইয়া দেও, প্রেমের গতি ফিরাইয়া দেও, প্রবৃত্তি সকলেরও গতি আপনাপনি ফিরিয়া যাইবে। হস্ত এখন দুষ্কার্য্যে রত হইতেছে, সে জন্য আঙ্গুলগুলি কাটিয়া ফেলিবার আবশ্যক নাই, হৃদয় বদলাইয়া দেও, সেই হস্ত আপনাপনি সদনুষ্ঠানে রত হইবে। পদদ্বয় এখন কুস্থানে লইয়া যায়, সেজন্য তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া খঞ্জ করিবার প্রয়োজন নাই; হৃদয় বদলাইয়া দেও, সেই পদদ্বয় তখন সাধুসঙ্গে লইয়া যাইবে।

জীবন পথের দুই দিকে দুই প্রকার প্রলোভন রহিয়াছে, ভক্তি সে উভয়কে পরিহার করিয়া থাকে। এক পার্শ্বে আসক্তি, অপর পার্শ্বে বিরক্তি। ভক্তি সহজ ভাবেই এই উভয়কে অতিক্রম করিয়া থাকে। প্রবৃত্তি কুলের চরিতার্থতা বা প্রবৃত্তিকুলের উচ্ছেদ, ইহার কিছুই ভক্তির লক্ষ্যস্থলে থাকে না; ভক্তির লক্ষ্য কেবল ভগবানের চরণ-সেবা। ইহা করিতে গিয়া সুখ আসে ভাল, দুঃখ আসে ভাল। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ তিনি সুখ বা দুঃখ, সম্পদ বা বিপদ, মিত্রতা বা শত্রুতা, এই সকল দ্বন্দ্বের অতীত; তাঁহার মন এ সকলের বাহিরে। ঈশ্বরের শ্রবণ মননে, সত্যের অনুধ্যানে ও ধর্ম্মের অনুসরণেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহার চিত্ত তাহাতেই বাস করে ও তাহাতেই বিহার করে। সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতিই তাঁহার উপেক্ষা বুদ্ধি থাকে। এতদ্দেশে দ্বন্দ্বাতীত শব্দের অর্থ অতি বিকৃতভাবে লওয়া হইয়াছে। এদেশের সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণ তাহার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তির নিকট শীত গ্রীষ্ম, মিষ্ট তিক্ত, সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই

সমান সেই দ্বন্দ্বাতীত। এই ভাব বিকৃত অদ্বৈতবাদ-প্রসূত। মূলগত সে ভাব এই, যে ভেদবুদ্ধি করে, সে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী নহে ; যে শীত গ্রীষ্মের বা সুগন্ধ দুর্গন্ধের প্রভেদ করে, তাহার ভেদবুদ্ধি প্রকাশ পায়, সুতরাং সে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী নহে। এই ভ্রান্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই পথাবলম্বিগণের অনেকে একটা অস্বাভাবিক অবস্থাতে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তি পথাবলম্বিগণ এরূপ কোনও অস্বাভাবিক পথের পথিক নহেন। তাঁহারাও দ্বন্দ্বাতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারে। ঈশ্বরের আদেশ পালনই তাঁহাদের জীবনের পরম লক্ষ্য হয়, আর সমুদায় উপলক্ষ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়; ইহাতেই তাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত। প্রেমই তাঁহাদের পরিচালক, প্রেমই তাঁহাদের গতি নির্ণয় করিয়া দেয়, প্রেমই তাঁহাদিগকে সুখ দুঃখের অতীত করিয়া রাখে।

কিন্তু এই প্রেম সম্পূর্ণ অন্তরের পদার্থ, আধ্যাত্মিক বস্তু। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বাহিরের বিষয় জগতে ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়াছে। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াকে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মচিন্তা বা ধর্ম্মভাব মানবঅন্তরে অভ্যুদিত হইলে তাহা কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। আদিম কালের মানুষ যখন সর্ব্বপ্রথম আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিল, তখন মৃত দলপতিদিগের কবরে তাহাদের পরিহিত অস্ত্র শস্ত্র, বসন ভূষণ দিতে আরম্ভ করিল ; মনে করিল, পরকাল যাত্রার সময়ে সেগুলির প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপেই ভারতীয় হিন্দুগণের পিণ্ডদান ও তর্পণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে এ সকল কথা শুনিয়া হাস্য করিতে পারি, কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়া যে এক সময়ের লোকের আন্তরিক বিশ্বাসের চিহ্ন-স্বরূপ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ সর্ব্বদেশেই এবং সর্ব্বজাতি মধ্যেই মানব-অন্তরের ধর্ম্মভাব বাহ্যক্রিয়ার আকার ধারণ করিয়াছে। যে ক্রিয়া এক সময়ে স্বাভাবিকরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী বংশপরম্পরাকে শাস্ত্ররূপে শাসন করিয়াছে।

চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, অন্তরের ধর্ম্মভাবের পক্ষে বাহিরের ক্রিয়ায় আকার ধারণ করা অতি স্বাভাবিক। জগতের ইতিবৃত্ত

আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কোনও নূতন সত্য বা নূতন ভাব মানব-হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহা স্বভাবতঃ আপনাকে দুই আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রথম, তাহা কতকগুলি বাহ্যক্রিয়াতে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়তঃ,সেই সকল নূতন সত্য ও নূতন ক্রিয়া লইয়া সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। এই সকল বাহ্যক্রিয়া ও এই সকল সমবিশ্বাসী মণ্ডলী সেই সেই সত্যের বহিরাবরণ বা কোষস্বরূপ হইয়া থাকে। বিধাতা এ জগতে সমুদায় জীবন্ত বীজকে এক একটী কোষের মধ্যে আবৃত রাখিয়াছেন। বৃক্ষের বীজটী কেমন কঠিন আবরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত! যতদিন তাহার অঙ্কুরের আকারে বহির্গত হইবার সময় না হয়, ততদিন সে কঠিন আবরণের মধ্যে থাকে; সেখানে বাতাতপের উপদ্রব হইতে সংরক্ষিত হইয়া আপনার শক্তিকে বিকাশ করিতে থাকে। ধর্ম্মবিধান সম্বন্ধেও সেই নিয়ম,—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য সকলকেও বিধাতা ক্রিয়ারূপ ও মণ্ডলীরূপ আবরণের মধ্যে রাখিয়া নিরাপদে বিকাশিত করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা আর একটী মহোপকার সাধিত হয়। এই সকল বাহ্যক্রিয়া লোকশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। প্রত্যেক সমাজে যে সকল সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেই সকল বিধি ব্যবস্থা তৎ তৎ সমাজস্থ নরনারীর শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ সহায়তা করিয়া থাকে, তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। ইংলণ্ডদেশে পার্লামেণ্ট মহা সভা নামে যে সভা বিদ্যমান আছে, তাহা থাকাতেই সে দেশীয় লোকদিগকে বংশ পরম্পরাক্রমে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতেছে, তাহা সহস্র উপদেশ দ্বারাও দেওয়া সম্ভব নহে। সর্ব্বদেশেই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। এই বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে দাম্পত্য নীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, শিশুপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষ যে উপদেশ পায়, তাহা অপর কোনও প্রকারে পাওয়া সম্ভব নহে। এই সকল সামাজিক বিধি ব্যবস্থা মানুষের দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবেশ করে; এবং মানুষের চিন্তা ও সামাজিক প্রবৃত্তিকে গঠন করে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা সকলেরও কার্য্য ঐ প্রকার। ধর্ম্মের এই সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে লোকের ধর্ম্মভাব সকল অল্পে অল্পে গঠিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করি-

বার জন্ম আমাদিগকে বহুদূরে গমন করিতে হইবে না। অপরাপর দেশে প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ কত প্রকার উপায় বিদ্যমান আছে। আচার্য্যগণ সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা মন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকগণ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ প্রকারে সাধরণ জনগণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এদেশে সেরূপ কোনও উপায় বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে বালকবালিকাগণ ধর্ম্মের যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল বিধিব্যবস্থা দেখিতে পায়, তদ্ভিন্ন তাহাদের সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার কোনও উপায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ প্রচলিত ধর্ম্মের ভাব সকল এদেশীয় জনগণের মনে যে প্রকার বদ্ধমূল এরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। ইহা ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের নীরব শিক্ষার ফল মাত্র।

অতএব ধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলকে কখনই হেয় মনে করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মকে সামাজিক ভাবে সাধন করিতে গেলেই ঐ সকল ক্রিয়াকে অবলম্বন করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা বিপদ আছে; তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য। মানুষ বাহিরের এই ক্রিয়া সকলকে ধর্ম্মসাধনের উপায়-স্বরূপ মনে না করিয়া অনেক সময়ে লক্ষ্য-স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। তখন মানুষের দৃষ্টি ভক্তিরূপ অন্তঃস্থিত সার পদার্থের প্রতি না থাকিয়া অসার বাহিরের ক্রিয়ার প্রতি নিবদ্ধ হয়; এবং মানুষ কতকগুলি প্রাণবিহীন ক্রিয়ার আচরণকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কেই এই ভ্রমে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এদেশে এমন শত সহস্র ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সম্পাদন বিষয়ে অতিশয় মনোযোগী, অথচ সুবিধা পাইলে বিধবার দুই বিঘা জমি কাড়িতে বা আবশ্যক হইলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত !! তাঁহারা নিত্য মালা জপিতেছেন, মালার কণ্টিকে কণ্টিকে অঙ্গুলি সকল ঘুরিতেছে, অথচ মন তাহার ত্রিসীমার মধ্যে থাকিতেছে না। মন হয়ত তখন সংসারের কোনও প্রকার ক্ষুদ্র চিন্তায় লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা প্রথমে নামসাধন বা জপমালার

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি মহৎ উদ্দেশ্যেই তাহা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ছিল যে, বার বার ঈশ্বরের স্বরূপের চিন্তাতে চিত্ত সমাধান করিয়া মানুষ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে ও তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু অভ্যাসের এমনি গুণ, সেই ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তারূপ বিষয়টাও একটা বাহিরের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বাহ্যভাব এতদূর গিয়াছে যে, নাম-জপের জন্য একপ্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা নাম সাধনার্থ একপ্রকার চাকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই চাকা ঘুরাইলেই একটা কাঁটা নামে নামে ঘুরিয়া যায় ও চাকা একবার ঘুরিয়া আসিলে অনেক বার নাম হইয়া যায়। যাহারা নাম জপের দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়, তাহারা অর্থ দিয়া এক একজন দরিদ্র পুরুষ বা রমণীকে নিযুক্ত করে, তাহারা ময়দা পেষার ন্যায় সমস্ত দিন চাকা ঘুরাইতে থাকে, এবং সেই নাম জপের পুণ্য অর্থদাতার হয়। অর্থদাতা হয়ত সেই সময়ে তাস খেলিয়া বা আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইতেছে। ওদিকে তাহার নামে লক্ষ লক্ষ নাম জপের পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে! ইহা অনেকের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ মধ্যেও ইহার অনুরূপ ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে। ধর্ম্মসাধনে প্রতিনিধি-নিয়োগ প্রতিদিন চলিতেছে। একজন গৃহস্থ একজন দূরস্থ আত্মীয়ের কোনও একটী অনিষ্ট নিবারণের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া কালীঘাটের কালীর মন্দিরে স্বস্ত্যয়নকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বস্ত্যয়ন করিলেন ব্রাহ্মণ, পুণ্য হইল গৃহস্থের, অনিষ্ট নিবারিত হইল তৃতীয় ব্যক্তির, যে হয় ত সেই মুহূর্ত্তে বহু বহু যোজন দূরে রহিয়াছে।

এই অসার ক্রিয়ার ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মে প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মগণ যে মনে করিবেন "আমরা আধ্যাত্মিক পূজায় পক্ষপাতী আমাদের ঐ বিপদ নাই," তাহাও মনে করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ এ বিপদ আমাদের পথেও রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্ম মনে করিতে পারেন, আমি সপ্তাহে সপ্তাহে রীতিমত উপাসনা-মন্দিরে যাই, প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকি, ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সমুদয় গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করি,

অতএব আমার ধর্ম্মসাধন হইতেছে। এরূপ চিন্তাতেও মহাভ্রম থাকিতে পারে। এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন, যিনি এ সমুদায় নিয়ম মনোযোগপূর্ব্বক পালন করিতেছেন, অথচ তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ভক্তি থাকা দূরে থাক্ তাঁহার মুখও সংসারের দিক্ হইতে ফিরে নাই। এমন মানুষ ব্রাহ্মসমাজেই রহিয়াছে, যাহাদের মনের উপর দিয়া অনেক উপাসনা ও অনেক উৎসব গড়াইয়া যাইতেছে অথচ তাহাদের মনের বিকার ঘুচিতেছে না। ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া ও বাহিরের আলোচনা দেখিয়া ভ্রান্ত হওয়া উচিত নহে। যদি ঐ সকল ক্রিয়া ও ঐ সকল আলোচনা হৃদয়কে স্পর্শ না করে তবে সে সকলে ফল কি? ঐ যে দেখিতেছ যুবক বা যুবতী এই মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে, তোমরা কি উহাকে দেখিয়া মনে মনে এই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছ যে, ঐ ব্যক্তি যখন এত ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনার মধ্যে রহিয়াছে,তখন উত্তরকালে ঐ ব্যক্তি একজন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইবে? অপেক্ষা কর, যদি উহার হৃদয়ে ভক্তি প্রবেশ না করে, যদি অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সংসারে একবার প্রবেশ করিলে আর ব্রাহ্মসমাজের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। স্বার্থে, সুখপ্রিয়তাতে ও আরামে এমনি ডুবিয়া যাইবে যে,আর তোমরা উহার উদ্দেশও পাইবে না। এই ভক্তি যদি আমরা না পাই,তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনার্থ যাহা কিছু করিতেছি, সমুদায় ভস্মে ঘৃত ঢালা হইতেছে। সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন যে ভক্তিধন, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার অধিকারী করুন।

অনুতাপ ও প্রেমের ধর্ম্ম।*

A broken and a contrite heart
O God, thou wilt not despise.

—*Ps.*—41, *Vers* 17.

অর্থ—ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়কে হে ঈশ্বর, তুমি অবহেলা করিবে না।

প্রেমের ধর্ম্মের ভিতরকার কথা হৃদয়-পরিবর্ত্তন। প্রেমের ধর্ম্মের সাধকগণের উক্তি সকল নিগূঢ়ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই হৃদয়-পরিবর্ত্তনের দিকেই তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি। জগতের চির-প্রচলিত ধর্ম্ম সকলে তাঁহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় নাই। সে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহাদের অন্তরে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। অভ্যাসগত ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল কোনও কোনও দেশে বংশপরম্পরানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে এবং সেই সকল অনুষ্ঠানের মাত্রা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন এক একজন মহাপুরুষ তৎতৎ দেশে অভ্যুদিত হইয়া তৎসমুদয়ের প্রতিকূলে আপনাদের মত সকল প্রচার করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। য়িহুদী দেশের যীশু, আরবের মহম্মদ, পঞ্জাবের নানক এবং বঙ্গদেশের চৈতন্য, এই সকল মহাজনের মধ্যেই এই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের উক্তি সকল যখন তুলনা করি তখন দেখিতে পাই যে সকলেরই উদ্দেশ্য এক, ভাব এক। প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং বলিয়াছেন,—"বাহিরের ক্রিয়াকলাপে, যাগযজ্ঞে ধর্ম্ম পাওয়া যায় না।" দেশ মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া জন বলিলেন,—"হে নির্ব্বোধ ও পাপাচারী লোক সকল! তোমরা বাহিরের ক্রিয়াকলাপ সকল বর্জ্জন কর; ও সকলে সন্তুষ্ট হইও না। কিসে হৃদয় পরিবর্ত্তন হয় তাহার চেষ্টা কর। তোমরা অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটে।"

* ১৮৯৬ সাল, ১২ই এপ্রেল রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

স্বদেশীয় লোক সকলকে দেখাইয়া যীশু আপনার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—"তোমরা ঐ সকল কপটী লোকদিগের ন্যায় হইও না। তোমরা দ্বিজাত্মা হইয়া শিশুদিগের ন্যায় হও।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকল দর্শন করিয়া চৈতন্য বলিলেন "ঐ সকল বাহিরের ব্যাপারে কিছুই হইবে না। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই; হরিনাম কর, হরিনাম কর।" এই হরিনামকে তিনি হৃদয় পরিবর্ত্তনের একটী উপায় স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রেমের ধর্ম্ম সাধকের চিন্তা ও ভাব একই অভিমুখে; সকলেরই উদ্দেশ্য হৃদয়-পরিবর্ত্তন।

অনুতাপই হৃদয় পরিবর্ত্তনের প্রধান উপায় স্বরূপ। এই দ্বার দিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যদি তুমি হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে চাও, যদি তুমি ভক্তি চাও, তবে সরল অন্তরে অনুতাপ কর; স্বীয় অপরাধের জন্য ঈশ্বর চরণে পড়িয়া ক্রন্দন কর। অনুতাপ রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে এ রাজ্যে প্রবেশের উপায় নাই। অনুতাপই যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়, তাহা এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণও অনুভব করিয়াছিলেন। মনু বলিয়াছেন :—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

মনু, ১১ অধ্যায়।

অর্থ—পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয়। এমন কার্য্য আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহার মন পুনরায় পবিত্র হয়।"

যে অনুতাপের এত গুণ, যে অনুতাপ মুক্তির দ্বার স্বরূপ, সে অনুতাপ কি প্রকার? আমরা সচরাচর অনুতাপ শব্দে যে সকল মানসিক অবস্থাকে বুঝি সে সমুদায়ই কি প্রকৃত অনুতাপ? সে সকলের দ্বারা কি হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়? সে সমুদায় কি মানবাত্মাকে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে? এই সকল প্রশ্ন হৃদয়ে লইয়া যখন অনুতাপের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখিতে পাই যে, যে সকল অবস্থা সচরাচর অনুতাপ শব্দে

অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার সকল প্রকৃত অনুতাপ নহে। প্রকৃত অনুতাপ কি? ও তাহার লক্ষণ কি? তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে কৃত্রিম অনুতাপ কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

প্রথম, এক প্রকার অনুতাপ আছে যাহা প্রশংসাপ্রিয়তারই রূপান্তর মাত্র। সে অনুতাপ নিন্দা প্রশংসা গণনা করে। এমন কত লোক আছে যাহারা হয় ত গোপনে গোপনে কোনও প্রকার পাপে লিপ্ত আছে। যত দিন তাহাদের পাপ লোকের অপরিজ্ঞাত থাকে, ততদিন তাহাদের অনুতাপের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; তাহারা প্রসন্নচিত্তে আহার বিহার করিয়া বিচরণ করে। যেই গোপনের পাপটী দশজনের বিদিত হইয়া পড়িল অমনি অনুতাপের ধূম দেখে কে? অমনি আহার বিহার বন্ধ! অমনি অনুতাপাশ্রুতে দিনরাত্রি ভাসমান। তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় এ ব্যক্তি বাস্তবিক দীনাত্মা ও ভগ্ন-হৃদয়; ইহার হৃদয় নিশ্চয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তাহার হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিবার একটা সুযোগ বটে। কারণ মানবের গর্ব্ব যখন ধূলিসাৎ হয়, তখনি তাহার অন্তরে আত্মগ্লানি জাগাইবার সময়। কিন্তু ইহা অনুতাপও নহে এবং হৃদয়-পরিবর্ত্তনও নহে। ইহা আহত প্রশংসাপ্রিয়তার আর্ত্তনাদ! লোকের নিকটে মান গেল এই চিন্তার যাতনা। লোকে একবার বলুক—"আহা! এমন কি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, এমন ত অনেকেরই হইয়া থাকে," অমনি দেখিবে যে তাহার অনুতাপের তীব্রতা আর থাকিবে না।

দ্বিতীয়, আর এক প্রকার অনুতাপ আছে যাহা আত্মম্ভরিতার রূপান্তর মাত্র। তাহা অহঙ্কার-সম্ভূত। সে অনুতাপের মধ্যে এই ভাবটা লুকাইয়া থাকে—"আমা হেন লোকের দ্বারা এরূপ কাজটা হইল!" মনটা আত্মম্ভরিতাতে পূর্ণ ছিল, আপনাকে জ্ঞানী গুণী ও বলবান বলিয়া বিশ্বাস ছিল, হঠাৎ প্রলোভনের কঠোর আঘাতে সে দর্পটা ভূমিসাৎ হইয়া গেল; মন লজ্জায় ও আত্মনিন্দায় পূর্ণ হইল। অতএব এ অনুতাপ অহঙ্কারের রূপান্তর মাত্র চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে এ অনুতাপও অনেক সময়ে বন্ধুর কার্য্য করে। দর্পহারী ভগবান অনেক সময়ে এইরূপে দর্পচূর্ণ করিয়া হৃদয়কে

পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ অনুতাপও সকল সময়ে হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করে না। প্রথম আঘাতের তীব্রতা একটু হ্রাস হইলেই এই সকল ব্যক্তি আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে; আত্মম্ভরিতা আবার পূর্ব্ববৎ হৃদয়কেপূর্ণ করিয়া ফেলে; রাজসিক প্রকৃতি আবার নিজশক্তি বিস্তার করিতে থাকে। সুতরাং সে হৃদয়ে ভক্তি পদার্পণ করিতে পারে না।

তৃতীয়,—আর এক প্রকার অনুতাপ আছে, তাহা স্বার্থবুদ্ধি-প্রসূত। পার্থিব ক্ষতিলাভের উপরে তাহা দণ্ডায়মান। তাহার মুলগত ভাব এই—"হায়! হায়! এমন কাজটা কেন করিলাম, আমার কত ক্ষতি হইয়া গেল। বেশ কাজটা ছিল তাহা গেল.বা বন্ধুবান্ধব সরিয়া দাঁড়াইল," এইরূপ ক্ষোভেও মানুষ অনেক সময়ে নিজের ওষ্ঠাধর দংশন করে।

এ সকলই কৃত্রিম অনুতাপ। ইহাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে না। প্রকৃত অনুতাপ ব্যতীত তাহা কখনই ঘটে না। প্রকৃত অনুতাপ আর এক প্রকার। তাহা বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিচ্ছেদ যাতনা সম্ভূত। তাহার মূলে এই ভাব,—"আমি এ কাজ কেন করিলাম যাহাতে সে সৌভাগ্য হারাইলাম! আমার কি যেন ছিল কি যেন চলিয়া গেল। আমি সেই হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ আছি, কিন্তু প্রাণ হইতে কে কি তুলিয়া লইল যে জন্য দরিদ্রের দরিদ্র হইয়া গেলাম। কি যেন ঘোর যবনিকা চক্ষের উপরে পড়িল যে জন্য পূর্ব্বের সে আলোক আর দেখিতে পাইতেছি না।" এই অবস্থাতে আত্মা বলিতে থাকে, "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" "হে রুদ্র! হে ভীতিপ্রদ, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।" এই অনুতাপে লোকের স্তুতি বা নিন্দার চিন্তা মনে আসে না; অথবা নিজের ক্ষতি বা লাভের গণনা হৃদয়ে উদিত হয় না। ইহাই হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে বর্ষার জলরাশি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যখন তদন্তরস্থ চূর্ণ সদৃশ পদার্থপুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়, তখন তন্মধ্যে এক প্রকার উত্তাপ জন্মে। সেই উত্তাপেরই প্রভাবে ধরাপৃষ্ঠ ঘন ঘন কম্পিত হয়; এবং কখনও কখনও ধরাপৃষ্ঠ বিদারণ করিয়া জ্বালারাশি ও দ্রবধাতু-পুঞ্জ বহির্গত হইতে থাকে; ইহাকেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। যেমন বর্ষার বারি ও ভূগর্ভস্থ

ধাতুপুঞ্জের সম্মিলনে ঘোর বিপ্লব ঘটে, তেমনি অকৃত্রিম অনুশোচনাতে ও মানব-হৃদয়ে বিপ্লব ঘটাইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে ভূকম্পের ন্যায় ঘন ঘন হৃৎকম্প হইতে থাকে, এবং দেখিতে দেখিতে হৃদয় রূপান্তরিত হইয়া যায়, ইহাকেই বলে প্রকৃত অনুতাপ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে প্রকৃত অনুতাপের লক্ষণ কি? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর ত অগ্রেই দেওয়া হইল। যাহাতে হৃদয়ে ও জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে তাহা প্রকৃত অনুতাপ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর তণ্ডুল যদি অন্নরূপে পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে যেমন স্বীকার্য্য নয় যে সে অগ্নির উপরে অনেকক্ষণ ছিল, তেমনি মানুষের জীবনে, তাহার চিন্তা বাক্য ও আচরণে, যদি কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তবে স্বীকার্য্য নয় যে, সে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃত অনুতাপ মানব-হৃদয়ে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে তাহার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে অনুতাপের পূর্ব্বকার লোক ও অনুতাপের পরের সেই লোক দুই যেন স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। যদিও অনেক স্থলে প্রকৃতি-নিহিত প্রাচীন দুর্ব্বলতা পুনরায় মাথা তুলিয়া থাকে, এবং হয়ত একেবারে অদর্শন হয় না, কিন্তু রুচি প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা যে প্রাচীন পথকে পরিত্যাগ করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে আমরা যে সকল অনুতপ্ত সাধকের জীবন চরিত পাঠ করি, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। মনুর বর্ণনানুসারে "আর এরূপ করিব না" বলিয়া তাঁহারা সকলেই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন। তবে হৃদয় পরিবর্ত্তন ও জীবন পরিবর্ত্তন প্রকৃত অনুতাপের প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ বিনয়। প্রকৃত অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে দীনতা আসে। তখন আর আত্মপক্ষ-সমর্থনের প্রবৃত্তি থাকে না। লোক-নিন্দাতে বিরক্তি বা বিদ্বেষের উদয় করে না। লোকনিন্দা শুনিলে প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন "তা ত ঠিক, ইঁহারা যা বলিতেছেন তাহা ত সত্য কথা; আমি ত এই নিন্দার প্রকৃত পাত্র।" তখন আর কাহারও প্রতি শত্রুতাবুদ্ধি জন্মে না। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। চীন

দেশে এই রীতি আছে যে, কোনও নূতন সম্রাট যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কারাবাসিদিগকে কারামুক্ত করা হয়। একবার একজন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বলিলেন যে তিনি নিজে কারাগারে গিয়া প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তিদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিবেন। তদনু-সারে কারাগারে গিয়া বন্দীদিগকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেককেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কেন এখানে আসিয়াছ, কতদিন আসিয়াছ" ইত্যাদি। অধিকাংশ বন্দী দুঃখ করিয়া বলিল যে তাহারা নিরপরাধ, কেবল দুষ্ট লোকে চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে বিপদে ফেলি-য়াছে।" এইরূপে সম্রাট এক একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অব-শেষে এক ব্যক্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, সে বাস্তবিক অপরাধী ও অপরাধের শাস্তিভোগ করিবার জন্যই সে কারাগারে আসিয়াছে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শাস্তি কি গুরুতর হইয়াছে ? তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল "না, আমার অপরাধ যেরূপ গুরুতর, শাস্তি তাহার উপযুক্ত হয় নাই। আমার আরও সাজা পাওয়া উচিত ছিল।" তখন সম্রাট বলিলেন—"দেখ, উহাদের অনেকে বলিয়াছে যে উহারা নিরপরাধ, তুমি নিজের মুখে স্বীকার করিতেছ যে তুমি অপরাধী। অতএব নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন দোষীর থাকা কর্ত্তব্য নহে, অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই বলিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। চীনের সম্রাট যে প্রণালীতে প্রকৃত অনুতাপের বিচার করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা প্রকৃত অনুতাপ নির্ণয় করিবার একটী প্রধান উপায়। যেখানে দীনতা নাই, সেখানে অনুতাপ নাই। যদি দেখ এক ব্যক্তি দুই দিন পূর্ব্বে একটী দুষ্কার্য্য করিয়াছে ও তজ্জন্য মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু দুই দিন না যাইতে যাইতে তাহার আচরণে আর দীনতার গন্ধও পাওয়া যায় না, আবার সে দশজনের মধ্যে মাথা তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে, সকল কাজে হাত দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত অনুতাপ তাহার হৃদয়কে অধিকার করে নাই। যে প্রকৃত অনুতপ্ত সে সকলের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে চায়। সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া টানিয়া সম্মুখে আনিতে হয়।

প্রকৃত অনুতাপের তৃতীয় লক্ষণ আশা। আপনার দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া দীনতা, ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আশা। অনুতাপ যখন মানুষকে ভবিষ্যতের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত করে, তখনি তাহা প্রকৃত পথে চালিত। যে অনুতাপে কেবল আত্মার শক্তি ক্ষয় হয় কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নতির কোনও উপায় হয় না, তাহা বিকৃত। যেমন কোনও ব্যক্তি যদি মৃত আত্মীয়ের শোকে কাতর হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কেবল শ্মশানে গিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে, এদিকে সংসারের কর্ত্তব্য সকল পড়িয়া থাকে, তবে যেমন আমরা তাহাকে বলি, এ শোক তোমার ব্যাধিবিশেষ, যে গিয়াছে তাহার জন্য এতটা সময় না দিয়া যাহারা এখনো আছে তাহাদের জন্য কিছু সময় দেও, তেমনি যে ব্যক্তি অতীতের দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া কেবল হা হতোস্মি করিয়া দিন কাটায়, কিন্তু বর্ত্তমানের উন্নতির কোনও উপায় অবলম্বন করে না, তাহাকেও বলিতে হয়, এ অনুতাপ তোমার ব্যাধি বিশেষ, অতীতের চিন্তাতে এতটা সময় না দিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতি বিধানে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে ভাল হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে, যে প্রকৃত অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গেই আশা থাকে। প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তি প্রলোভনের গুরুতর আঘাতে পতিত হইলেও ঈশ্বরের করুণাকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় দণ্ডায়মান হইবার প্রয়াস পান।

অনুতাপের লক্ষণ জানিলে কি হইবে, আমাদের অন্তরে যে অনুতাপের উদয় হয় না ইহাই ত ব্যাধির প্রধান চিহ্ন। আমাদের জীবনে কি অনুতাপের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই? কেহ কি এরূপ মনে করেন, "আমরা ত কোনও গুরুতর পাপাচরণ করিতেছি না, তবে এত অনুতাপ আবার কি করিব। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ আমরা স্মরণ করি না। তাহা যদি আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই 'হায় হায়' করিতে হয়, কারণ আমাদের জীবনের অপূর্ণতা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। নিরন্তর আমরা জীবনের উন্নত ভূমি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি; নিরন্তর স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে অপারগ হইতেছি; এবং প্রবল প্রবৃত্তিকুলকে সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিতে অসমর্থ হইতেছি। আমাদের যদি আত্ম-পরীক্ষার অভ্যাস থাকে, এবং আপনাদের

এই সকল ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা স্মরণ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই দীনভাবাপন্ন থাকিতে হয়।

বদ্ধ ধর্ম্ম ও মুক্ত ধর্ম্ম।*

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

উপনিষদ্।

অর্থ—"সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে জানিলে, কর্ম্ম-বন্ধন ক্ষয় হয়।"

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" এরূপ সাধকের কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়, এই কথায় তাৎপর্য্য এ দেশের সাধকগণ আর এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার এক অর্থ জ্ঞানীদিগের পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ কর্ম্মের চরম ফল যে জ্ঞান, তাহা যখন তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসের পথই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত পথ। ইহার আর এক প্রকার অর্থ আছে, যে ব্যক্তি জ্ঞানসিদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই নিরস্ত হইয়াছে। তিনি পাপ বা পুণ্য উভয়েরই অতীত হইয়াছেন। পাপের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম এবং পুণ্যের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত স্বর্গবাস, তিনি এই উভয়েরই অতীত। স্বর্গ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, জন্ম তাঁহার আর হয় না। আমরা কিন্তু এই প্রচলিত উভয় অর্থে উক্ত বচনকে গ্রহণ করি নাই। আমরা এই অর্থে পূর্ব্বোক্ত বচনকে গ্রহণ করিয়াছি যে, সেই পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করিলে মানুষ কর্ম্মরূপ বন্ধনে আর আবদ্ধ থাকে না। ইহার অর্থ এ নয়, যে সেরূপ ব্যক্তি আর কর্ম্মের আচরণ করেন না, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে তিনি কর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে আবদ্ধ হন না। একটু নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে। একটী শস্য অপরটী ত্বক্। ত্বক্‌টী শস্যের রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ত্বক্‌টী শস্য নহে।

---

* ১৮৯৬ সাল ১৯শে এপ্রেল রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

১১

জগতের সকল বিদ্যারই দুইটী দিক আছে, একটী আধ্যাত্মিক অপরটী লৌকিক বা ব্যবহারিক। আধ্যাত্মিক দিকে বিদ্যা জ্ঞান-সমষ্টিকে বর্দ্ধিত করে, চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে, জগদ্দর্শনেরও বিচারের শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, মানবচরিত্রে বিজ্ঞতা, বিমৃষ্যকারিতা. আত্ম-সংযম প্রভৃতি গুণকে বিকাশ করে, বিদ্যার কোনও লৌকিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক তাহা মানবাত্মাতে পূর্ব্বোক্ত ফল সকল উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু বিদ্যা কেবল মানবের আত্ম-কোষে বদ্ধ থাকে না; লৌকিক জীবনেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কোনও নূতন বিদ্যা অধিগত হইলেই মানব-মনে এই চিন্তার উদয় হয় ঐ বিদ্যাকে জগতের কোন্ ইষ্ট-সাধনে নিয়োগ করা যাইতে পারে? তখন ঐ বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ লৌকিক ইষ্ট-সাধনের দিকে চিত্তকে প্রেরণ করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে জনসমাজের সুখ সৌকর্য্য বৃদ্ধির নানা প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপে প্রায় সর্ব্ববিধ বিদ্যাই মানবের লৌকিক সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হইয়াছে,অধিক কি গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-গণের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেও মানুষ আপনার লৌকিক ইষ্টসাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার ফলস্বরূপ সমুদ্র-বক্ষে নৌচালনার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এইরূপে পদার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রভূত গবেষণার দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণ সামগ্রী যে কিছু দেখিতে পাইতেছি, সে সমুদায় পদার্থ-বিদ্যার উন্নতির ফল মাত্র।

বিদ্যার যেমন দুইটা দিক আছে, ধর্ম্মের ও তেমনি দুই দিক আছে। আধ্যাত্মিক দিক ও লৌকিক দিক। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দিক আত্মা পরমাত্মাতে যোগ, অনন্ত গতি ও অনন্ত মতি হইয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষে প্রীতি স্থাপন। এইটুকু ধর্ম্মের সার ভাগ। ফলের মধ্যে যেমন বীজ, দেহের মধ্যে যেমন অস্থি, ধর্ম্মের মধ্যে তেমন এইটুকু প্রকৃত সার বস্তু। বীজ না থাকিলে যেমন ফল থাকে না, অস্থি না থাকিলে যেমন দেহ দাঁড়ায় না

তেমনি এটুকু না থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মই দাঁড়ায় না। যে জীবনে এই সার ভাগ টুকুর পরিমাণ অল্প, কিন্তু বাহিরের ভাব বা ক্রিয়া অধিক, তাহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণাস্থি সম্পন্ন মাংস ও মেদময় দেহের ন্যায় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। যাহা হউক ধর্ম্মের এই আধ্যাত্মিক দিকে আমাদের ঈশ্বরের সহিত যোগ; এখানে আমরা তাঁহারই সন্নিধানে বাস করি, তাঁহার প্রেমের অমৃত রস আস্বাদন করি। এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম হৃদয় মনকে উন্নত করে, চিত্তকে আনন্দে পূর্ণ করে, ও মনকে সমুদায় ক্ষুদ্র বিষয়ের আসক্তি হইতে উদ্ধার করে।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কেবল অন্তর রাজ্যেই বদ্ধ থাকে না। আত্মাতে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইলেই, সাধকদিগের চিত্তে এই চিন্তার উদয় হয় যে সেই অন্তরস্থিত আদর্শকে মানবের ও মানব সমাজের বাহিরের জীবনে প্রয়োগ করিলে কি ফল উৎপন্ন করিবে? তদ্দ্বারা কি মানুষকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে? এইরূপ চিন্তা হইতেই শাস্ত্র ও দর্শন রচনা, সাধন প্রণালী নির্দ্দেশ ও বিবিধ সামাজিক রীতি নীতির সৃষ্টি। যদিও আমাদের দেশে এরূপ অনেক সাধক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবে আপনারাই তুষ্ট, জীবের দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নাই, তথাপি ইহা ঈশ্বরের করুণা বলিতে হইবে যে সকল সাধক এ ভাবাপন্ন নহেন। তাঁহাদের অনেকে জীবানুকম্পা পরবশ হইয়া আপনাদের অন্তরনিহিত সুমিষ্ট ধর্ম্মকে জগতে বিতরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মহাত্মা বুদ্ধ ছয় বৎসর কাল নিরঞ্জন নদীর তীরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, মনে করিলে জীবনের অবশিষ্টকাল কি সেই নদীতীরেই ধ্যানস্থ হইয়া যাপন করিতে পারিতেন না? কিন্তু কে তাঁহাকে সে বিশ্রাম সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিল? তাঁহার শিষ্যগণ উত্তর করিবেন—জীবানুকম্পা। ঠিক কথা এই সকল মহাজনের অন্তরে জীবানুকম্পা এত অধিক ছিল যে,তাহা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাগ লইয়া আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকিতে দেয় নাই।

কিন্তু এই যে জগতকে ধর্ম্মভাব বিতরণের চেষ্টা ইহা হইতে আর এক প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হয়ত এই সকল মহাজন প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। সে অনিষ্ট ফল এই, ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া সকল মানুষের

বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তরস্থিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে লৌকিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার শাসন, নীতি ও সাধন প্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞ মানবগণ সেই সকল বাহ্য ক্রিয়া কলাপকেই ধর্ম্মবোধে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম বলিতে তাহারা তাহাই বোঝে ও সেই সকল নিয়মের পরিপালন করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। এই বদ্ধ ধর্ম্মে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ। ধর্ম্মের উদারভাব তাহাদের অন্তরে নাই। তাহারা চিরদিন তুচ্ছ মত ও ক্রিয়া লইয়া ধর্ম্মের বহিঃপ্রাঙ্গণেই মারামারি করে। কোন্ নিয়মের বা বাহিরের কোন্ ক্রিয়ার কোথায় ত্রুটী হইল, তাহাই কেবল গণনা করে; অন্তরের প্রেম ঈশ্বরে অর্পিত হইল কিনা তাহা অনুসন্ধান করে না। এইরূপে এই বদ্ধ ধর্ম্মের উপাসকগণ এক ঘোর আত্ম-প্রবঞ্চনার মধ্যে পড়িয়া থাকে। যে মুক্তি লাভের জন্য ধর্ম্মের উপদেশ সেই মুক্তি লাভের দিকে কোনও দৃষ্টি থাকে না। চরিত্রে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়, সংসারাসক্তি হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ অবাধে রাজ্য করিতে থাকে, অথচ এই বদ্ধ ধর্ম্মের উপাসকগণ মনে মনে এই ভাবিয়া আপনাদিগকে প্রবোধ দেন যে ধর্ম্ম সাধন চলিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন এইরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা দৃষ্ট হয়, সামাজিক জীবনেও সেই প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমাজ মধ্যে সর্ব্ববিধ দুর্নীতি প্রকাশ পাইতেছে, নরনারী সংসারাসক্তি ও বিলাস পরায়ণতাতে ডুবিতেছে, কেহ কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেছে না, সামান্য সামান্য কারণে দলাদলি উপস্থিত হইয়া হিংসা ও বিদ্বেষের গরলে সমাজ ছারখার হইয়া যাইতেছে, অথচ তাহারা এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেছে যে স্বর্গরাজ্য তাহাদের মধ্যেই অবতীর্ণ; ধর্ম্ম তাহাদের এক চেটিয়া সম্পত্তি! জগদীশ্বর এরূপ অহঙ্কার অধিক দিন সহ্য করেন না। তাঁহার প্রদত্ত গুরুতর শাস্তি অবিলম্বে আসিয়া এই সকল ব্যক্তিকে ও এই সকল সমাজকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়; তাহারা লোকের অবজ্ঞা, নিন্দা ও কুৎসার তলে ডুবিয়া যায়। এইজন্য আমরা ইহা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে বদ্ধ ধর্ম্ম মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ভূরি ভূরি দেখিতেছি যে

লোকে এই প্রকার বদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে বাস করিয়া ও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে না; তাহাদের চিত্ত-বিকার ঘুচিতেছে না।

কিন্তু এই বদ্ধ ধর্ম্মের পার্শ্বেই মুক্ত ধর্ম্ম বলিয়া একটা পদার্থ আছে। অনন্তগতি ও অনন্তমতি হইয়া ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিলেই সে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ইহাকে মুক্ত ধর্ম্ম বলা হইয়াছে কারণ বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহা স্বাধীনতাকে আনিয়া দেয়। আত্মা তখন মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় প্রেমালোকে বিচরণ করিতে থাকে। এই মুক্ত ধর্ম্ম স্বভাবতঃই উদার; কারণ প্রেম সকল প্রকার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মানব-হৃদয়কে জগতের সঙ্গে একীভূত করিয়া দেয়। যেমন কোনও নদীর শাখা প্রশাখা ধরিয়া যাহারা তাহার উৎপত্তি স্থানের অভিমুখে গমন করিতে থাকে, যতই সেই আদি উৎসের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই যেমন তাহারা পরস্পরের নিকটস্থ হইতে থাকে, এবং সেই আদি উৎসে উপস্থিত হইলে যেমন পরস্পরকে একত্র দেখিতে পায়, তেমনি ধর্ম্মের উৎস স্বরূপ যে বিশুদ্ধ ভক্তি তাহাতে যাঁহারা উপস্থিত হন, তাঁহারা সকল ভক্তকে সেখানে দেখিতে পান। বদ্ধ ধর্ম্মের রাজ্যে মানুষ যতদিন বাস করে, ততদিন জাতিভেদ লইয়া মারামারি করিয়া থাকে, কিন্তু প্রেমের মুক্ত ধর্ম্মের আস্বাদন একবার পাইলে জাতিভেদ আপনাপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। প্রেমের মুক্ত ধর্ম্মের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর নীতি-শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ খুলিয়া নীতির উপদেশ সকল পাঠ করিতে হয় না; কিন্তু তাঁহারা আত্ম-মধ্যেই জীবন্ত নীতি দর্শন করিয়া থাকেন।

এই প্রেমের মুক্ত ধর্ম্ম যাহারা সাধন করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাব সম্পন্ন। তাঁহারা কি বাহিরের কোনও প্রকার সাধন প্রণালী অবলম্বন করেন না? আবশ্যকমত তাঁহারা বাহিরের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদুপরি তাঁহাদের সমগ্র নির্ভর নহে। তাঁহাদের সাধন-প্রণালী ও আধ্যাত্মিক। তাঁহাদের অন্তরে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতে থাকে। আত্ম-সংযম, বৈরাগ্য বিনয় এক একটি সাধন করিতে তাঁহাদিগকে কত চক্ষের জল ফেলিতে হয়, কত আত্ম-বলিদান করিতে হয়, কত আত্ম-পরীক্ষা, চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে হয়। অন্তরের এই সংগ্রামের

প্রতিই তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি। এই সংগ্রাম যদি কোনও কারণে মন্দীভূত হয় তাহা হইলে ইহারা বিপদ গণনা করেন, সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধামান্দ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা আর সুস্থির থাকিতে পারেন না; আত্মাকে পীড়িততপ্ত জানিয়া তখনি তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হন। জগদীশ্বর আমাদের সকলেরই অন্তরে সময়ে সময়ে ব্যাকুলতা ও সংগ্রামের উদয় করিয়া থাকেন; তাহা তাঁহার আহ্বানধ্বনিস্বরূপ। তিনি যেন নিদ্রিত আত্মাকে ডাকিয়া বলেন—"আর কত আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? উত্থান কর, জাগ্রত হও," প্রেমিক সাধকগণ এই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হন, এবং সেই বাণীর অনুসরণ করেন; কিন্তু সুখ-প্রিয় প্রকৃতি শুনিয়াও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করে। তাহার শাস্তি এই হয়, ঈশ্বরের প্রেম মুখ সে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। হায় হায়! এইরূপে আমরা কতবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও অবহেলা করিয়াছি! আপনাদের মৃত্যু আপনারা ডাকিয়া আনিয়াছি!

বদ্ধ ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সত্য স্বরূপকে সত্যভাবে দর্শন করা। যতদিন মানুষ সত্যকে না দেখে ততদিন অপরের সাক্ষ্যের নির্ভর করিতে হয়, যে যাহা বলে শুনিতে হয় ও করিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি স্বভাবতই পরাধীন। তুমি যে দেশ দেখ নাই, তাহার বিবরণ পর্য্যটক-দিগের গ্রন্থে পড়িয়া জানিতে হয় ও তদুপরিই নির্ভর করিতে হয়। যে সে দেশ দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি সে সম্বন্ধে স্বাধীন ও মুক্ত। তাহার নির্ভর নিজের অভিজ্ঞতার উপরে। তাহার হৃদয়স্থ জ্ঞানকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারে না, তাহার জ্ঞান লোকের অনুরাগ বিরাগের উপরে নির্ভর করে না। দশজনে সাক্ষ্য দিলে বাড়ে না, বা দশজনে বিরোধী হইলে কমে না। সেইরূপ যিনি সত্য-স্বরূপকে সত্যভাবে দর্শন করিয়াছেন তিনিই মুক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম আর গুরু বা শাস্ত্রের উপরে নাই; আত্মার স্বাধীন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এরূপ হৃদয়ের প্রেমের উৎস কখনই বিশুষ্ক হয় না।

নাল্পে সুখমস্তি। *

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখমস্তি।

উপনিষদ।

অর্থ—যিনি ভূমা তাঁহাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

ঋষিগণ আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, আত্মা সেই অনন্ত ও মহান পুরুষের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনেতেই সুখী হইয়া থাকে; যাহা কিছু ক্ষুদ্র ও পরিমিত তাহাতে মানবাত্মার প্রকৃত তৃপ্তি নাই। ইহার কারণ এই,—অনন্তই আত্মার বাস ও বিহারের ভূমি। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মার উচ্চ ভাবগুলির বিষয়ে চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাদের প্রকৃতির মধ্যেই অনন্তত্ব নিহিত রহিয়াছে। আমরা কল্পনা দ্বারা তাহাদের কোনও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। চিন্তাতে এরূপ একটী রেখা পাই না, যাহার ওদিকে আর সত্য নাই, বা যাহার অপর দিকে আর ন্যায়ের গতি নাই, বা প্রেমের প্রসার নাই। সুতরাং আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা অনুভব করা যায় যে আমরা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অধ্যাত্ম দিকে অনন্তমুখীন। আমরা যেন এমন একটী প্রাসাদে বাস করিতেছি, যাহার সম্মুখে একটী পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিপথকে রোধ করিতেছে, কিন্তু পশ্চাৎদিকে অকূল সমুদ্র প্রসারিত। মানবপ্রকৃতির মধ্যে এই অনন্তের ভাব নিমগ্ন আছে বলিয়াই মানবাত্মা মহৎ ও উদার বিষয়ের চিন্তাতে সুখী হইয়া থাকে। এ বিষয়ে মানবাত্মার প্রকৃতি যেন মৎস্যের প্রকৃতির ন্যায়। মৎস্যকে যতই দীর্ঘায়তন সরোবরে রাখিবে, ততই তাহার বলবীর্য্য ও শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে, আর যতই তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন স্থানে আবদ্ধ করিবে, ততই তাহার দুর্গতি। একদিন

* ১৮৯৬ সাল ২৬শে এপ্রেল রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এক সময়ে একটী ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ে ও একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাতে এক জাতীয় মৎস্যের শিশু ছাড়িয়া দেও, এবং দুই বৎসর পরে একদিনে একই সময়ে উক্ত উভয় জলাশয় হইতে মৎস্য ধর, উভয়ে কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। যে সকল মৎস্য এই দুই বৎসর কাল ক্ষুদ্রায়তন জলাশয়ে বাস করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ও কদাকার, কিন্তু যাহারা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা সবল সুন্দর ও দীর্ঘকায়। ইহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়াছি। মৎস্যগণ যে পরিমাণে ক্রীড়া ও বিহার করিবার ক্ষেত্র পায়, সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান গৃহস্থগণ অনেক সময়ে বড় বড় পুষ্করিণীর পার্শ্বে তালবৃক্ষ সকল রোপণ করিয়া থাকেন; অভিপ্রায় এই, বায়ু সমাগমে ঐ সকল তালবৃক্ষের পত্রের এক প্রকার শব্দ হয়, যাহাতে ত্রস্ত হইয়া মৎস্যগণ চারিদিকে দৌড়িতে থাকে। তাহারা যতই দৌড়ে ততই তাহাদের শরীর বাড়িতে থাকে। মৎস্যকে ক্ষুদ্র স্থানে রাখিলে, ক্ষুদ্রকায় হইয়া যায় ইহা আমরা কতবার দেখিয়াছি। কলিকাতা সহরের ধীবরগণ অনেক সময়ে বহু দূরবর্ত্তী স্থান সকল হইতে মৎস্য আমদানী করিয়া বাজারে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্য বহুদিন নৌকার গর্ত্তে ও তৎপরে জল কলসে বাস করে। কিছুকাল ঐরূপ সংকীর্ণ স্থানে বাস করিলেই তাহাদের আকৃতি ও বর্ণ বিকার প্রাপ্ত হয়। তখন লোকে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে থাকে। মানবাত্মাকে উদার, মহৎ ও পবিত্র বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে নিরন্তর রাখিলে তাহারও দশা ঐ প্রকার হইয়া থাকে। সেরূপ আত্মার বলবীর্য্য, শ্রী, সৌন্দর্য্য সমুদায় অন্তর্হিত হয়।

স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি লইয়া জনসমাজে বাস করিতে গেলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনিবার্য্য। প্রত্যেক দিন আমাদের হৃদয় দ্বারে নব নব চিন্তাকে আনয়ন করে, প্রত্যেক দিন নব নব অভাব ঘটিতে থাকে, সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই সকলে মনোনিবেশ করিতে হয়। কেবল তাহা নহে, সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এক অর্থে সে সমুদায় আমাদের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমরা সকল সময়ে তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম্মসাধনের

অস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি না। অনেক সময়ে ঐ সকল বিষয়ে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়ি যে, তাহাদের অতিরিক্ত যে আরও কিছু আছে, মন যেন তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়। জীবন ধারণের উচ্চ লক্ষ্য সকল বিস্মৃত হইয়া মন জীবনধারণের উপায় গুলিকেই লক্ষ্য বলিয়া অবলম্বন করে। ইহাকেই বলে বিষয়াসক্তি। বিষয়াসক্তিতে মানবাত্মাকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যক্তির চিন্তা ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, দৃষ্টি ক্ষুদ্র, আশয় ক্ষুদ্র, বন্ধুতা ক্ষুদ্র, সকলি ক্ষুদ্র।

একদিকে বিষয় যেমন মানুষকে ক্ষুদ্র করে, অপর দিকে সেই অনন্ত অবিনাশী পুরুষের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন তাহাকে মহত্ত্বসম্পন্ন করে; এবং তাঁহার স্বরূপ যে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা তাহারও চিন্তনে মানবাত্মা মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাহাতে যে কেবল মহত্ত্ব লাভ হয় তাহা নহে, তাহাতে গভীর তৃপ্তিও আছে। জলে বিহার করিয়া মৎস্যের তৃপ্তি, আকাশে উড়িয়া পক্ষীর তৃপ্তি। বিধাতা যাহাকে যে শক্তি বা বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচালনাতেই সুখ। অনেকবার অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে একটী কুকুর একটী বায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের পশ্চাতে এমনি ব্যগ্রতা ও উৎসাহের সহিত ছুটিতেছে যেন সেটী তাহার পক্ষে কত প্রয়োজনীয় বস্তু। অথবা একটী গোবৎস ঊর্দ্ধ-লাঙ্গুল হইয়া এমনি ছুটিতেছে যেন কে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ অঙ্গ সকলের চালনা-জনিত সুখ। দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়াতেই এক প্রকার আনন্দ। একটী ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি নাড়িয়া খেলা করিতেছে, তাহার হস্তপদ দুই মিনিটের জন্য ধরিয়া রাখ, পূর্ব্ববৎ নাড়িতে দিও না, দেখিবে সে ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। সে ক্রন্দন করিল কেন? তুমিত তাহাকে আঘাত কর নাই, বা অপর কোনও প্রকারে ক্লেশ দেও নাই। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, তাহার হস্তপদের সঞ্চালন নিবন্ধন তাহার যে সুখ হইতেছিল, তাহার ব্যাঘাতই তাহার অসুখের কারণ। এইরূপ উন্নত ও উদার বিষয় সকলের অনুধ্যানেই আত্মার উন্নত বৃত্তিচিনয়ের পরিচালনা ও বিকাশ হইয়া থাকে, তান্নিবন্ধন একপ্রকার গভীর আধ্যাত্মিক সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল তাহাও নহে, ইহার উপরে

আবার ঈশ্বর-সহবাসের সুখ। অদ্ভুত প্রকৃতি সম্পন্ন অমরাত্মার পূর্ণ তৃপ্তির বিষয় তিনি। তাঁহাতে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রাতে বিরাজিত সুতরাং তাঁহাকে পাইলেই আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ চরিতার্থতা। যেমন ক্ষুধার সময় অন্ন লাভ করাতে তৃপ্তি, পিপাসার সময় বারি লাভ করাতে তৃপ্তি, তেমনি তাঁহাকে লাভ করিয়া অমরাত্মার তৃপ্তি। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং।"

কিন্তু সেই অনন্তের চিন্তাতেই মানবের আনন্দ একথা বলিয়া ঋষিরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা বলিলেন—"নাল্পে সুখমস্তি"—অল্পেতে সুখ নাই। এই কথা আমরা দুই প্রকার অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম, যাহা ক্ষুদ্র ও পরিমিত, যাহা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই। কারণ তাহা এক দিন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার সীমা আমি দেখিতে পাই, তাহা আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আমার চিত্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; মন তাহার উপরে নির্ভর করিতে পারে না, তাহার হস্তে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহা আমাদের আত্মার বিশ্রাম-ভূমি নহে। ইহার আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে তাহা এই—যাহা অল্প অর্থাৎ আমাদের আত্মা যাহা চাহে তাহা অপেক্ষা কম, তাহাতে আত্মার সুখ নাই। সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষা, সুতরাং যাহা সত্য নহে কেবল ছায়া মাত্র, তাহা লইয়া আমাদের আত্মা সুখী হয় না। জগতের মহাজনদিগের জীবন-চরিত যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তাঁহারা যেন বহুদিন অতৃপ্ত অন্তরে কি একটা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন; এবং যতদিন সেই বস্তুটা ধরিতে না পারিয়াছেন, ততদিন তাঁহাদের চিত্ত কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। চির প্রচলিত ধর্ম্মের যে সকল ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক সন্তুষ্ট থাকিয়াছে, তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। সে সকলকে তুষ বোধে উপেক্ষা করিয়া যেন তাঁহারা কি শস্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই শস্য কি? যাহা না হইলে আর সমুদায়ই অসার হইয়া যায়?

প্রকৃত সাধকদিগের এই সার শস্যের প্রতিই প্রধান দৃষ্টি। ইহা অপেক্ষা যাহা অল্প অর্থাৎ হীন তাহাতে তাঁহারা কোনও রূপেই তৃপ্ত হইতে পারেন

না। সকল বিষয়েই সারটী না দিয়া অসার বস্তু দিলে বুদ্ধিমান লোকে সন্তুষ্ট হয় না। মনে কর একজন দোকানদার তোমার নিকট প্রাপ্য টাকার জন্ম তাগাদা করিতে আসিয়াছে। তুমি তাহাকে এস ভাই, বস ভাই বলিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইলে, ভদ্রতার রীতি অনুসারে পান তামাক দিলে, প্রচুর পরিমাণে মৌখিক সৌজন্ম প্রদর্শন করিলে, অনেক গল্প গাছা হাস্ম পরিহাস করিলে কিন্তু তাহার টাকা কয়টী কবে দিবে তাহার কিছু বলিলে না। ইহাতে কি সে সন্তুষ্ট হয়? সে কি তোমার পান তামাক ও সৌজন্ম দেখিয়া ভুলে? কখনই না, অবশেষে সে তোমাকে বলে, "মহাশয়! ও সব কথা থাক্ টাকা কয়টী কবে দিবেন বলুন।" সেইটী তার সার কথা! সেটীর বন্দোবস্ত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোনও সৌজন্মে তার মন ভুলে না। অথবা মনে কর, একজন প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ছাত্র গুরু-সন্নিধানে কোন কোনও দুর্ব্বোধ বিষয়ের অর্থ জানিতে চাহিয়াছে। গুরুর নিজেরই সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান নাই; অথচ ছাত্র-সন্নিধানে তাহা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন; তিনি বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া ছাত্রকে ভুলাইতে চাহিতেছেন, স্বর্গ মর্ত্ত্যের কত কথা আনিতেছেন, কত দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধিমান ছাত্র অতৃপ্ত থাকিয়া মনে মনে বলিতেছেন—"বৃথা বাগাড়ম্বরে ফল কি, আসল কথার ত কোনও মীমাংসা হইল না।" তেমনি প্রকৃত ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগেরও অন্তরে একটা আসল কথা থাকে সেটার কোনও উপায় না হইলে, বাহিরের ধর্ম্মের ক্রিয়া সকলকে বৃথা আড়ম্বর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

ধর্ম্মের ভিতরকার এই আসল কথাটা কি? আসল কথাটা বিষয়াসক্তির অভাব অর্থাৎ প্রধান মনটা ঈশ্বরে ও গৌণ মনট সংসারে রাখা। যাহার প্রধান মনটা সংসারে গৌণ মনটা ঈশ্বরে সেই বিষয়ী, এবং যাঁহার প্রধান মনটা ঈশ্বরেও গৌণ মনটা সংসারে তিনিই ধার্ম্মিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতে হইলেই গৃহস্থ মাত্রেরই বাস্-ভবনে একটা রন্ধনশালা রাখিতে হয়; তাহা অনিবার্য্য রূপে প্রয়োজনীয়। গৃহস্থ মাত্রেই স্বীয় স্বীয় রন্ধনশালাকে আপনাদের কার্য্যের উপযোগী করিয়া লয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ রন্ধনশালার উপরে প্রধান মন রাখে না; শয়নে স্বপনে

রন্ধনশালায় ধ্যান করে না; প্রধান মনটা সংসারের উন্নতি বিষয়ে থাকে। এইরূপ সংসারে বাস করিতে গেলেই খাইয়া পরিয়া থাকিতে হয়, খাইয়া পরিয়া থাকিবার জন্য অর্থোপার্জ্জন, অর্থ-সংস্থান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, সে কাজটাকে যথাসাধ্য আপনাদের অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লও, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু প্রধান মনটা তাহার উপরে না রাখিয়া আত্মার উন্নতির উপরেই রাখ। এই ভিতরকার কথা। সেই জন্যই বলি, যিনি প্রধান মনটা বিষয়-সুখে না রাখিয়া ধর্ম্মে রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই ধার্ম্মিক।

এখন প্রশ্ন এই প্রধান মনটা ধর্ম্মের উপরে থাকে না কেন? এই প্রশ্ন লইয়াই সাধু মহাজনগণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিপথাবলম্বিগণ ভাবিলেন ভগবানে অকপট প্রেম ও ভক্তি অর্পিত হইলেই প্রধান মনটা ধর্ম্মের উপরে পড়িবে। সেই জন্য তাঁহারা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া অবলম্বন করিলেন। প্রকৃত ভক্তি ভিন্ন কেহই মানব-হৃদয়ের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। আবার ভক্তি দীনতা-প্রসূত। ভক্তিবিহীন জ্ঞান, ও ভক্তিবিহীন ক্রিয়া অহঙ্কারকে উৎপন্ন করে, রাজসিক ভাবকে প্রবল করে। ইহা প্রমাণিত সত্য। বৈরাগ্য ও দীনতা দ্বারা মানব-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তির জন্য উন্মুখ হয়। এই কারণে ভক্তির সাধকগণ উক্ত উভয় ভাবের উদয় করিয়া মানব-হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং যে ভক্তির দ্বারা মানব-হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় তদপেক্ষা অল্প যাহা তাহাতে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের মন যেন সর্ব্বদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছে—"নাল্পে-সুখ মস্তি" "নাল্পে সুখমস্তি" "অল্পে সুখ নাই" "অল্পে সুখ নাই।" আমরা কি সময়ে সময়ে এরূপ অতৃপ্তি অনুভব করি না? আমাদের ও মন কি অনেক সময়ে ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া কলাপে অতৃপ্ত হইয়া বলে না,—"এ সকল ত অসার, সার বস্তু কিরূপে পাইব? "নাল্পে-সুখ মস্তি,"—যাহা ক্ষুদ্র, যাহা পরিমিতি, যাহা হীন তাহাতে সুখ নাই।

পরমাত্মজাত আত্মা। *

The wind bloweth where it listeth and thon hearest the the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth : so is every one that is born of the spirit."

অর্থঃ—বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয় এবং তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথায় তাহা যাইতেছে; তাহা বলিতে পার না; পরমাত্মজাত প্রত্যেক আত্মাই এইরূপ।

অন্ন, পান, সূর্য্যকিরণ, বর্ষার জল প্রভৃতি যে সকল স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি মানবদেহের উপরে কার্য্য করে তাহাদিগকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি ও কার্য্য বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞ আছি। বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা তাহাদের কার্য্যের প্রণালী ও নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্ব্যতীত এমন সকল সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তি আছে যাহাদের কার্য্যের ক্রম আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেন তাহারা আমাদের দেহের উপরে কার্য্য করে, কি প্রণালীতে সেই কার্য্য হয়, এ সকল বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যেমন, সে কালের লোকে বিশ্বাস করিতেন যে গ্রহনক্ষত্র সকল নভোমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত হইলে মানবের জীবনের উপরে বিশেষ বিশেষ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে এদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রহনক্ষত্রগণ কোনও সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় প্রণালীতে মানবের ভাগ্যকে নিয়মিত করে কি না জানি না; কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে মানবের দেহের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের দেহ বাত-

* ১৮৯৬ সাল ৩রা মে রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

রোগগ্রস্ত তাঁহারা অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে এ সকলের পর্য্যায় অনুসারে তাঁহাদের দৈহিক অবস্থার ইতরবিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তিথিবিশেষে তাঁহাদের পীড়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বিষয়টীও যে ভূয়োদর্শন দ্বারা অভ্রান্তরূপে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমির উপরে স্থাপিত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না।

আর এক প্রকার সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তির কার্য্য আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন কোনও সহরে বসন্ত কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তাহাদের ভয়ে সেই নগরবাসী লোকদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়, কিন্তু কেন যে ঐ সকল রোগ এত সংক্রামক, কেন যে উহারা মানবদেহকে এমন কঠিনরূপে আক্রমণ করে, তাহা আমরা জানি না। চিকিৎসা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে ঐ সকল রোগের সূক্ষ্ম বীজ সকল জল, বায়ু, অন্ন, পান প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া মানবদেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল সূক্ষ্মবীজ যে কি প্রকার, কেন যে তাহারা এক দেহে কার্য্য করে এবং অপরদেহে করে না, সে বিষয়ে তাঁহারা অদ্যাবধি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলিয়া থাকেন যে, যে দেহ predisposed থাকে অর্থাৎ উক্ত বীজ সংক্রমনের অনুকুল অবস্থাতে থাকে, তাহাতে উহার শক্তি প্রকাশ পায়। এ কথা বলিবার জন্য বিজ্ঞানবিদের আবশ্যক নাই। ইহা সকলেই জানে যে, যে দেহ রোগের বীজ পাইবার পক্ষে অনুকুল তাহাতেই সেই বীজ সংক্রান্ত হয়। কিন্তু সেই অবস্থার কারণ ও লক্ষণ কি? দেহ কিরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে সূক্ষ্ম ভৌতিক শক্তি সকল অতি বিচিত্র ভাবে মানব-শরীরের উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। কি প্রণালীতে এবং কি নিয়মে যে তাহারা কার্য্য করে,তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবলমাত্র তাহাদের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই।

ভৌতিক বিষয়ে আমরা যেমন সূক্ষ্ম শক্তির আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতেছি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতে পাই। মানব

মনের উপরেও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। এমন কি, মানবের হর্ষ বিষাদের সহিত বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যেরও অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগত মানবমনের উপরে অতি আশ্চর্য্য লীলা করিয়া থাকে। রক্তমাংসবিশিষ্ট আমাদের এই জড়দেহের সহিত আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহের এত নিকট সম্বন্ধ, মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত মনের এত ঘনিষ্ঠ যোগ যে, সম্পূর্ণ বাহিরের বিষয় সকলও অনেক সময়ে আমাদের মানসিক রাজ্যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। বাসন্তী পুর্ণিমার রজনীতে যখন ধীরে ধীরে মলয় পবন প্রবাহিত হইতে থাকে, প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধভার বহন করিয়া যখন সেই পবন চতুর্দ্দিককে আমোদিত করে, শুভ্র জ্যোৎস্নালোক যখন তাবত পদার্থে পতিত হইয়া কমনীয় স্নিগ্ধ কান্তিতে ধরার মুখকে পূর্ণ করে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কাহার চিত্ত না আপনাপনি আনন্দে পূর্ণ হয়? চিরবিষণ্ণ ব্যক্তিও তখন অন্ততঃ একটী বারের জন্যও আর সকল দুঃখ ভুলিয়া সে দৃশ্য উপভোগ করে। আবার বর্ষাকালের দিনে শ্রাবণের বর্ষাধারা যখন অবিরাম গতিতে পড়িতে থাকে, প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়া পড়িতে হয়, শয়নে উপবেশনে যখন সুখ পাওয়া যায় না, বিশ্রামের সুখ যখন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না, এবং ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন আকাশ যখন গভীর গর্জ্জনে মেদিনীকে কম্পিত করে, তখন আপনাপনিই মনের মধ্যে একপ্রকার বিষাদ প্রবিষ্ট হয়; চিত্ত আপনাপনিই গম্ভীর ভাব ধারণ করে। এইরূপ অজীর্ণতা রোগেও মানুষকে বিষণ্ণ, বিরক্ত এবং নরদ্বেষী করিয়া ফেলে। মানুষের যদি পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয়, রাত্রিকালে উত্তমরূপ নিদ্রা না হয়, পাকস্থলীর যন্ত্র সকল প্রকৃত অবস্থাতে না থাকে, তাহা হইলেও মানব মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয়; মানবচিত্তে চিরবিষণ্ণতার উদয় হয় এবং সেরূপ মানুষ সচরাচর নরদ্বেষী হয়; তাহার স্বভাব উগ্র হয়; সকল কার্য্যেই মন বিরক্ত হয়; কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না; সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী; সে যেন কি এক প্রকার বিরক্তির ও বিষাদের চসমা পরিধান করে, যাহার দ্বারা সে সকলকেই বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, সকলকেই বিরক্তির চক্ষে দর্শন করে।

আমরা যে 'নরপ্রেম' 'নরপ্রেম' বলিয়া চীৎকার করি, এই নরপ্রেমিক হইবার জন্য, ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য, মানুষের ভালরূপ পরিপাকক্রিয়া হওয়া আবশ্যক। আমি একবার একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে কোনও এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যখন কেহ দীক্ষার্থী হইয়া আসিত তখন অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাহাকে প্রশ্ন করা হইত যে, তাহার উত্তমরূপ পরিপাক হয় কি না। যখন আমি ইহা পাঠ করি, তখন প্রথমতঃ আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল, যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দীক্ষার্থীকে আবার "তোমার ভালরূপ পরিপাক হয় কি না? রাত্রিকালে উত্তমরূপ নিদ্রা হয় কি না?" এ সকল প্রশ্ন কেন? তৎপরে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে ধর্ম্মসাধনের জন্য এ সকলের অতিশয় প্রয়োজন। অজীর্ণদোষ ও অনিদ্রা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে এক প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে ভৌতিক জগতও আধ্যাত্মিক রাজ্যে অতি বিচিত্র কার্য্য সকল করিয়া থাকে।

আবার এক আত্মার উপরে অপর আত্মার যে কার্য্য তাহার প্রকৃতি ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই কারণেই সামাজিক উপাসনা আবশ্যক। যেখানে দশটী আত্মার শক্তি মিলিত হয় সেখানে অতি আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে। আমরা মাঘোৎসবের সময় দেখিয়াছি সে সময়ে এই মন্দিরে এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। সে দিনের দৃশ্য কি চমৎকার! কি সুন্দর! কেন এরূপ হয়? এই একই মন্দির, একই আচার্য্য, একই উপাসকমণ্ডলী,—সে দিন যে নূতন কেহ আসিয়া বেদীতে বসেন, নূতন উপাসকমণ্ডলীর দ্বারা মন্দির পূর্ণ হয় তাহা নহে, কিন্তু সে দিন এই মন্দিরে কি এক নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কেন এমন হয়? ইহার কারণ এই যে, সে দিন উপাসকগণ কি এক নূতন ভাবে, কি এক নূতন ব্যাকুলতার সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, যে ব্যাকুলতা এক আত্মা হইতে অপর আত্মাতে সঞ্চারিত হয়। সে দিন এক আত্মার প্রেম অপর আত্মাতে গিয়া সঞ্চারিত হয়, সে দিন শক্তি, সংক্রামক রোগের ন্যায়, এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

আমরা সকলেই অনেকবার দেখিয়াছি যে ভয় সাহস প্রভৃতিও এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে দশটী

বালক বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন কোনও কারণে ভীত হইয়া "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি আর সকলে নিমেষের মধ্যে চমকিয়া উঠিল এবং সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহা কেমন সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। সাহস সম্বন্ধেও এইরূপ। রণক্ষেত্রে সৈন্যগণ পরাস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া নিরাশ হৃদয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে একজন বীর-হৃদয় যোদ্ধা "ভয় নাই, অগ্রসর হও" বলিয়া বজ্র-গম্ভীর নিনাদে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, অমনই সকলে আবার বীরবলে বলী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইহা কেমন সংক্রামক!

আবার বশীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা একজন অতি আশ্চর্য্যরূপে আপনার সমুদয় ভাব অপর জনের অন্তরে ঢালিয়া দিতে পারে। যেমন, একজন সুবক্তা উৎসাহ প্রভৃতি স্বীয় হৃদয়ের ভাব সকল অতি বিচিত্র ভাবে শ্রোতৃবর্গের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। তিনি স্বীয় ইচ্ছামত শ্রোতৃবর্গকে হাসাইতে এবং কাঁদাইতে পারেন। মানব-হৃদয়ের উপরে মানব মনের এই কার্য্যের কথা ভাবিলেই অনুভব করা যায় যে আমাদিগকে উৎসাহিত, উন্মাদিত ও অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, এমন আচার্য্য, গুরু বা নেতা থাকা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। যে দলে উন্মাদিত, ও অনুপ্রাণিত করিবার উপযুক্ত কেহ নাই, তাহা দিন দিন অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম শক্তি বহুল পরিমাণে ভৌতিক হইলেও ইহাদের কার্য্য বহুল পরিমাণে আধ্যাত্মিক।

কিন্তু এ সকল অবস্থাকেও আত্মার বহিঃপ্রকোষ্ঠের ব্যাপার বলা যাইতে পারে; ইহারও অন্তরে, আত্মার অন্তরতম স্থানে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে শক্তি অতি কোমল, অতি চমৎকার। তাহা মানব মনের উপরে সত্যের শক্তি, বিবেকের শক্তি ও প্রেমের শক্তি। মানব চিত্তের উপরে সত্যের একটা শক্তি আছে, যাহা তাহার চরিত্রের উপরে কার্য্য করে; যাহা তাহার সকল কার্য্যকে নিয়মিত করে। সত্যকে যিনি জানিয়াছেন, সত্য তাঁহার বাক্যে কার্য্যে এবং চিন্তায় প্রবিষ্ট হয়। সত্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার আচরণ করা তাঁহার পক্ষে

অসম্ভব হয়; তিনি যেন সত্যগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ইহারই নাম সত্যের শক্তি। যেমন সত্যের শক্তি আছে, সেইরূপ আবার বিবেকের একপ্রকার শক্তি আছে, অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না। যখনই সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করিতে যায়, তখনই ভিতর হইতে কে যেন বলিতে থাকে,—"ছি! ছি! এমন কার্য্য করিও না," অমনই সে ব্যক্তি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অন্যায়ের পথ হইতে মন আপনাপনি সরিয়া দাঁড়ায়। ইহার নাম বিবেকের শক্তি। এইরূপ আবার প্রেমের শক্তি। প্রেম মানুষকে স্বার্থনাশে প্রবৃত্ত করে ও অপরের বোঝা বহিতে নিযুক্ত করে। এই সকল শিক্ষা যখন একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়, তখন অদ্ভুত মানবচরিত্র গঠিত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল প্রকৃতির উপরে ইহাদের শক্তি সমান হয় না। সত্য জানিলেই আমি তদনুসারে চলিতে বাধ্য,—যাহা গর্হিত তাহা বর্জ্জন করিতে এবং যাহা কিছু সৎ তাহা গ্রহণ করিতে আমি বাধ্য, ইহা সকলে অনুভব করে না। কত লোক কত উৎকৃষ্ট সত্য সকল দিবানিশি শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু সকল হৃদয়ে তাহাদের শক্তি হয় না; তাহা যদি হইত, তবে এত দিনে মানবসমাজ আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা প্রতিদিন যে সকল উচ্চ উচ্চ সত্য লাভ করিতেছি, জগতের সাধুরা হয়ত তাহার শতাংশের একাংশও প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহারা যে একটু সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই প্রাণে এমন আশ্চর্য্য শক্তির সঞ্চার হইয়াছে যে, তাহার জন্য আর সকলকে অতি হীন বিবেচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে সত্য জানিলেই তাহাতে প্রাণে বলের সঞ্চার হয় না। প্রেম সম্বন্ধেও ঐরূপ;—প্রেমেরও বাধ্যতা সকল প্রকৃতির উপর সমান নহে।

সত্য, ন্যায় ও প্রেমের যে শক্তি তাহা ঈশ্বরেরই শক্তি। উহা যে কি নিয়মে, কি প্রণালীতে মানব প্রাণে আবির্ভূত হয় এবং কি প্রণালীতে তিরোহিত হয়, তাহা আমরা জানি না। উহার অনুকূল অবস্থাই বা কিরূপ আর প্রতিকূল অবস্থাই বা কিরূপ তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। উহা বায়ুর গতির ন্যায় আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করে। কখন যে আসিবে,

কি নিয়মে যে আসিবে, তাহা আমরা জানি না। আমরা কেবলমাত্র উহা উপভোগ করি। বায়ু যে কখন এবং কি প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে, তাহা যেমন আমরা জানি না, তথাপি উহার প্রবেশের নিমিত্ত যেমন গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিয়ম ও প্রণালী সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও প্রার্থনারূপ দ্বার আমাদিগকে সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং উহার আবির্ভাবের নিমিত্ত ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, নবজীবন প্রাপ্ত বা পরমাত্মজাত আত্মাই সেই শক্তি অনুভব করিয়া থাকে। নির্ম্মলচিত্ত, পবিত্রাত্মা, সত্যানুরাগী ব্যক্তিদের জীবনেই ব্রহ্মশক্তির অপূর্ব্ব ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বিধাতা যেন, কি এক মধুর স্বরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অন্য সকল কার্য্য ছাড়িয়া, ক্ষতিলাভ গণনা ভুলিয়া, উন্মত্তের ন্যায় সে চরণে আত্মসমর্পণ করেন। তাহাই তাঁহাদের মিষ্ট লাগে; আর সকলই তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সে মধুর স্বর শ্রবণ করা যায় না।

এই যে ব্রহ্মশক্তি, ইহার আবার দুই প্রকার কার্য্য আছে। এই কারণে বায়ুর সহিত ইহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। বায়ুর দুই প্রকার গতি আছে,—সাধারণ গতি ও বিশেষ গতি। এই যে বায়ু প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবাহিত থাকিয়া আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে সাহায্য করে, ইহা বায়ুর সাধারণ গতি। আর যখন উহা খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া মহা প্রলয়ের আকার ধারণ করে এবং বৃক্ষলতাদির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে তখন উহার বিশেষ গতি দেখিতে পাই। কিন্তু এই যে বিশেষ গতি, উহার কি কোনও নিয়ম নাই?—অবশ্য আছে। উহা আর কিছুই নহে, কেবল এই সাধারণ বায়ু ঘনীভূত হইয়া মহা-ঝটিকাতে পরিণত হয়। সেইরূপ কোনও সত্য যখন কোনও জাতি মধ্যে বাস করিতে থাকে, তখন ব্রহ্মশক্তির সাধারণ কার্য্য, আর যখন সেই সত্য ঘনীভূত হইয়া কোনও সাধু মহাজনের ভিতর দিয়া প্রবল ঝটিকার আকারে বাহির হয়—তখন উহার বিশেষ কার্য্য।

সাধু মহাজনগণের জীবনেই ব্রহ্মশক্তির বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই।

শত শত হৃদয়ে যে সত্যাগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহাই তাঁহাদের এক এক জনের হৃদয়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি সকল সাধুর জীবনেই এই বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা এক এক জন এক এক মহাসত্য প্রাণে ধারণ করিয়াছেন, যাহার জন্য জীবন যৌবন সকলই বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যেন ঈশ্বরের কি এক মহা আহ্বান ধ্বনি শুনিয়াছেন যাহার জন্য ধন মান প্রাণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক সাধুর জীবনেই এই ভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা অধর্ম্মকে ভয় করেন। অন্যায়ের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। মানবদেহ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলে যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিণী শক্তি লোপ প্রাপ্ত হয়, জগতের সাধুগণও অসত্যের গন্ধ পাইলে কি এক প্রকার আধ্যাত্মিক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, যাহাতে তাঁহাদের আত্মা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মার্জ্জারশাবককে যেমন বহু চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়াও জলে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া যদি ক্রমাগত টানাটানি করা যায়, তথাপি সে যেমন জলে যায় না, সাধুদিগকেও সেইরূপ বহু আয়াস বহু চেষ্টা দ্বারাও অন্যায়ের পথে লইয়া যাওয়া যায় না। ইঁহারা সত্যের সেবক; সত্যেতে ইঁহাদের বাস, সত্যেতে ইঁহাদের স্থিতি, সত্যই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন।

সাধু মহাজনগণ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা সাধন করিয়াছেন, আমাদিগকে সামাজিক ভাবে তাহাই করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মহালক্ষ্য। আমাদের আত্মা যাহাতে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কঠোর সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু করিতে হইবে, প্রত্যেককেই দেহ মন পবিত্র রাখিয়া বায়ুর গতির ন্যায় তাঁহার শক্তির নিমিত্ত ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলেই জনসমাজে নবজীবন আসিবে এবং ব্রহ্মশক্তির বিশেষ ক্রিয়া এখানে দেখিতে পাইব। তখন লোকে আমাদের তেজ এবং শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইবে। যদি ধর্ম্মসাধন করিতে হয় তবে এই ভাবেই করা উচিত নতুবা এ বিড়ম্বনা কেন?—পরমেশ্বরের নাম করিব, অথচ প্রাণে তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করিব না, সত্য, ন্যায় এবং প্রেম আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিবে না, এ কেমন কথা? অন্ন আহার করিব, জল পান করিব, অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইবে না, ইহা কি সম্ভব? ঈশ্বর করুন, আমরা সকলে অকপটচিত্তে তাঁহার শক্তির হস্তে যেন আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি!

আধ্যাত্মিক আলস্য।*

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—উপনিষদ।

অর্থ—এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থে দায়ূদের সংগীতাবলী নামে একটী গ্রন্থ আছে, তাহা অতি উপাদেয়। ঈশ্বরে অকপট প্রীতি ও একান্ত নির্ভরের জন্য উক্ত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, তাহা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কিরূপ ভাবে ও কিরূপ অবস্থাতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বোক্ত বচনটী তাহার নিদর্শন স্বরূপ। সে বচনটী এই :—

Hold up my goings in thy paths that my footsteps slip not.—Ps. XVII-Ver 5.

অর্থ :—হে প্রভো! আমি যখন তোমার পথে চলিতে চেষ্টা করি, তখন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর, যেন আমার চরণ স্খলিত না হয়।

যত প্রকার সন্দেহে ধর্ম্মার্থীদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, প্রার্থনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ক সন্দেহ তন্মধ্যে প্রধান। প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের সকলকেই একথার সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, আমাদের অনেক প্রার্থনা বিফলে গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত আমরা ঈশ্বরের নিকটে যত প্রার্থনা করিয়াছি, সে সমুদয় যদি পূর্ণ হইত, তবে আর ভাবনা ছিল না। মানুষ প্রার্থনা করে অনেক, কিন্তু তাহার মধ্যে সফল হয় অতি অল্প। এ প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় যে, এত প্রার্থনা বৃথা যায় কেন? দ্বিতীয়তঃ, অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, দুইজন ধর্ম্মার্থীর মধ্যে একজনের জীবনে

* ১৮৯৬ সাল ১৭ই মে রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

প্রার্থনার অতি আশ্চর্য্য ফল ফলে, আর একজনের জীবনে তাহার ফল কিছুই দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ত বিশ বৎসর কিম্বা ত্রিশ বৎসর কাল ধর্ম্মসমাজের ক্রোড়ে পড়িয়া রহিয়াছেন, সাপ্তাহিক বা পারিবারিক উপাসনাতে রীতিমত যোগ দিয়া থাকেন, ধর্ম্মসমাজের বিধি সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, এবং ঈশ্বর-চরণে নিত্য অনেক সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্নতির বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না। তিনি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিলেন আজিও তাহাই রহিয়াছেন। সেই স্বার্থপর, ক্ষুদ্রাশয়, সংকীর্ণ চেতা ও অনুদার মানুষ রহিয়াছেন; সেই কামী, ক্রোধী, ঈর্ষাপরতন্ত্র লোক রহিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি যদি আজি আসিয়া দেখেন, হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবেন যেখানকার মানুষ সেখানেই রহিয়াছে। বিষয়াসক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; জ্ঞান বা প্রেমের গভীরতা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই; চরিত্রে ভক্তির বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই। চিন্তা করিয়া দেখ কত ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে এ কথা সত্য। আবার এরূপ লোকও দেখিতেছি, যাঁহারা ব্যাকুল প্রার্থনার গুণে দিন দিন অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। এই উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহাদের জীবনে কি সুমিষ্ট ফলই প্রসব করিতেছে! প্রার্থনা যদি ধর্ম্মজীবন লাভের একটী প্রধান উপায় হয় তবে তাহার ফলে এত তারতম্য হয় কেন? একই ঈশ্বরের নাম ত দুই ব্যক্তিই করিয়া থাকেন, একই ধর্ম্মসমাজে ত দুইজনেই রহিয়াছেন এবং একই উপদেশ ত দুইজনেই শ্রবণ করেন, তবে এরূপ প্রভেদ কেন লক্ষ্য করি? এতদ্দ্বারা এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সকল লোকে প্রার্থনার সমাধিকারী নহে। ভাষা রচনার শক্তি মানব মাত্রেরই আছে, সুতরাং ইহা দেও, তাহা দেও বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে সকলেই প্রার্থনা জানাইতে পারে। কিন্তু সকল প্রার্থনা প্রার্থনা নয় এবং সকলে প্রার্থনার অধিকারীও নহে। তাহা যদি হইত তবে ঈশ্বরের নামের এত গৌরব থাকিত না; ধর্ম্মসাধনেরও প্রয়োজনীয়তা থাকিত না।

এক অর্থে ইহা সত্য যে সকলেই প্রার্থনার অধিকারী। কারণ এমন পাপী কেহই হইতে পারে না, যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত

হইবে! অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, ঈশ্বরের আরাধনা করিবার, বা তাঁহার সেবা করিবার বা তাঁহার স্বরূপ জানিবার পক্ষে অধিকার সকলের থাকে না। বিশেষ সাধনাদ্বারা এ সকল অধিকার লাভ করিতে হয়। কিন্তু প্রার্থনা সম্বন্ধে বরং একথা বলিতে পারা যায় যে, যে যত দরিদ্র, যে যত দুর্ব্বল, যে যত পতিত,সেই তত প্রার্থনার অধিকারী। যেমন দীন হীন ব্যক্তি-গণেরই ধনীদিগের দয়াতে অধিকার, তেমনি পাপী তাপীদিগেরই পতিত-পাবন পরমেশ্বরের কৃপাতে অধিকার। যে সন্তানটী গৃহে আছে তদপেক্ষা যেটী বিপথে গিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই পিতার অধিক ব্যগ্রতা; সুতরাং সেটীর পিতার কৃপাতে অধিক অধিকার।

তথাপি এ কথাও সত্য যে, প্রার্থনার একটী বিশেষ ভাব আছে, ইহার বিশেষ কিছু নিয়ম আছে। দায়ুদের সঙ্গীতের মধ্যে বলা হইয়াছে,—"হে প্রভো! যখন আমি তোমার পথে চলিতে চেষ্টা করি, তখন তুমি আমাকে তুলিয়া ধর।" অর্থাৎ আমি যখন নিরাশার হস্তে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া যথাসাধ্য নিজ শক্তিকে প্রয়োগ করি, যখন আমি বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, তখন তুমি আমাকে সাহায্য কর। ইহার বিপরীত উক্তি বিষয়ে একবার চিন্তা কর। যখন আমি নিজে চেষ্টা না করি যখন আমি যথাসাধ্য আত্মশক্তি প্রয়োগ না করি, তখন তুমি সাহায্য করিও না; তখন আমার তোমার নিকটে সাহায্য চাহিবার অধিকার নাই। কেমন চমৎকার কথা! যে সংগ্রাম করে, সেই সাহায্য পায়। যে ব্যক্তি উঠিতে চাহিতেছে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে এবং তাহার জন্য দিবানিশি চেষ্টা করিতেছে, যতবারই পতিত হইতেছে ততবারই নব প্রতিজ্ঞা-বলে দৃঢ় হইয়া উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহারই প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে; তাহারই প্রার্থনা সফল হয়। ইহাই জগদীশ্বরের রাজ্যের নিয়ম। তিনি যেন মানুষকে বলিয়া থাকেন,—'তোমার যাহা করিবার কর, আমার যাহা করিবার করিতেছি।' তিনি কৃষককে বলিতেছেন,—"তুমি ভূমি কর্ষণ কর, আমি বারি বর্ষণ করিতেছি। তুমি যদি ভূমি কর্ষণ না কর, তুমি যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শ্রম না কর, তবে আমার করুণার

ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার যথাশক্তি তুমি কাজ কর, আমার যাহা করিবার তাহা আমি করিব। সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" এই নিয়মেই তাঁহার রাজ্য চলিতেছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার এই একই কথা। তাঁহার কার্য্যের প্রণালীর বিষয়ে চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যাঁহারা তর্ক করেন যে তিনি ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, তবে তাঁহার দ্বারে প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি আছে? তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কি জগতের ধন ধান্য উপার্জ্জনে, কি বিদ্যালাভে, কি ধর্ম্মসাধনে সর্ব্ব বিষয়েই মানবের উন্নতিকে তিনি কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সাধনা-সাপেক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন। যদ্দারা আমাদের শারীরিক অভাব সকল পরিপূরিত হইতে পারে, সে সকল সামগ্রী এই ধরাগর্ভে বা ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের অজ্ঞতা নিবারিত হইতে পারে, সেই জ্ঞানের উপকরণ-সামগ্রী সকল এই জগৎ গ্রন্থ ও মানব-প্রকৃতিরূপ গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে; যদ্দারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে, এরূপ তত্ত্ব সকল ও আত্মরাজ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অন্বেষণ কর, আবিষ্কার কর, আয়ত্ত কর, সাধনার দ্বারা নিজস্ব কর, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। কুক্কুটী যেমন পদদ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িয়া সন্তানের খাদ্য দ্রব্য নিজেই চাপা দিয়া রাখে, অভিপ্রায় এই সন্তান নিজে অন্বেষণ করিয়া তাহা আবিষ্কার করুক ও ভোগ করুক তদ্দারা তাহার বুদ্ধি কৌশলের বিকাশ হইবে; সেইরূপ জগতের মাতাও যেন খনির গর্ভে মণিকে, সাগরের গর্ভে মুক্তাকে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের গর্ভে জ্ঞানকে ও আত্মতত্ত্বের নিম্নস্তরে অধ্যাত্ম বিদ্যাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন, অন্বেষণ কর, তবে তাহা মিলিবে। তোমার সাধ্যে যাহা হয় কর, ঈশ্বরের করুণা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আবার বলি:—যে মানুষ সংগ্রাম করে, যে ব্যক্তি আপনার শক্তি সকলকে খাটাইতে চায়, যে ব্যক্তি মস্তকের ঘর্ম্মবিন্দু পায়ে ফেলিয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহারই প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে; তাহারই প্রার্থনা তাঁহার চরণে গৃহীত হয়। আর যে চেষ্টা করে না, যে ব্যক্তি সুখের বালিশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে চায়, ঈশ্বরের করুণা তাহার জন্য নহে। একথার আলোচনা আমরা অনেকবার করিয়াছি যে,

প্রার্থনার একটা দায়িত্ব আছে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত একবার এই বেদী হইতে দেওয়া হইয়াছিল। মনে কর, একজন জেলার মাজিষ্ট্রেট লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে তারযোগে প্রার্থনা জানাইলেন—"শীঘ্র একদল সৈন্য প্রেরণ করুন, এখানে প্রজারা বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা"—অথচ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রেরিত সৈন্যদল যখন যথাস্থানে উপস্থিত হইল, তখন শুনিল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকার খেলিতে গিয়াছেন। তাহা হইলে সেই সেনাদলের সেনাপতির মনে কি প্রকার ভাব হয়? তিনি কি মনে করেন না বিদ্রোহের আশঙ্কা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কারণ সে আশঙ্কা যদি যথার্থ হইত তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট শিকার খেলিতে যাইতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের হস্তে যে কিছু সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহা লইয়া কোনও প্রকারে মহারাণীর রাজ্য রক্ষা করিবার উপায় করিতেন। অথবা মনে কর কোনও স্থানের কয়েক জন ভদ্রলোক রাজপুরুষদিগের নিকটে এই আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, প্রজাদিগের মহা অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে। দলে দলে লোক সাহায্যের অভাবে মারা পড়িতেছে; অথচ রাজপুরুষদিগের নিযুক্ত কর্ম্মচারী গিয়া দেখিলেন যে, আবেদনকারীদিগের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ লোক অথচ কেহও এক কপর্দ্দকও দরিদ্রদিগের সাহার্য্যার্থ দেন নাই; তখন তাঁহাদের সেই আবেদনের প্রতি কাহারও আস্থা থাকে কিনা ও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় কিনা? সেইরূপ ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমি যাহা চাহিতেছি সে সম্বন্ধে আমার যাহা করণীয় আছে, তাহা করিতেছি কিনা? তাহা না হইলে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।

এ স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আধ্যাত্মিক আলস্য বলিয়া এক প্রকার অবস্থা আছে। যেমন অনেক শ্রম-বিমুখ ছাত্র আলস্যবশতঃ অভিধান দেখিতে চায় না, শ্রম করিতে চায় না, অথচ বিদ্যা লাভ করিতে চায়, তেমনি অনেক ধর্ম্মার্থীও বিনা পরিশ্রমে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে চায়। মণি মুক্তা যেমন শ্রম বিনা লাভ করা যায় না, তেমনি পরমার্থতত্ত্বও বিনাশ্রমে কেহ লাভ করিতে পারে না। সংশয়, নিরাশা, প্রবৃত্তিকুলের বিদ্রোহিতা প্রভৃতি অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে আনন্দধামে উপনীত হইতে হয়। যে সকল তত্ত্বের

উপরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহার এক একটীকে অধিগত করিতে কত শত জ্ঞানীর কত বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তথাপি তাঁহারা অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিতে পাইতেছেন না। উপনিষদকার ঋষি যে বলিয়াছেন :—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—আমি অন্ধকারের পরপারে, এই আদিত্যবৎ উজ্জ্বল মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।" ইহা কি সামান্য সাধনের ফল ? "অন্ধকারের পরপারে," এই কথাগুলির মধ্যে কি গভীর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে ! তুমি যদি অন্ধকার ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে ভয় পাও, যদি সংশয় ও নিরাশার আন্দোলন সহিতে অসমর্থ হও, তবে সে জ্যোতির্ম্ময় ধাম তোমার জন্য নহে। যাহাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক আলস্য প্রবল, ও শ্রম বিমুখতা স্বাভাবিক, তাহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের একটা সহজ পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মন সর্ব্বদাই বলিতেছে, যদি এমন একটা পথ পাওয়া যায়, এমন একটা মানুষ পাওয়া যায়, যাহা পাইলে আর এই সংশয়-নিরাশার আন্দোলন সহ্য করিতে হয় না, প্রবৃত্তিকুলের আঘাতে অস্থির হইতে হয় না, খনির অন্ধকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া রত্ন অন্বেষণ করিতে হয় না, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। আমাদের সকলেরই মন কি সময়ে সময়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলে না,—"আর এ সংগ্রাম ভাল লাগে না, একবার উঠা আবার পড়া, এ যাতনা আর সহ্য হয় না, যদি এমন একজন মানুষ পাই, যাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলে এই কঠোর সংগ্রাম হইতে জন্মের মত বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে এখনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এরূপ দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আমাদের জীবনে স্থায়ী হয় না। আমরা পরক্ষণেই চিন্তা করি, যে বিধাতা ধর্ম্ম-ধনের ন্যায় পরম ধনকে বহু শ্রমসাধ্য করিয়াছেন, সংগ্রামে কাতর হইলে চলিবে না। অমনি সে দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। যাঁহারা আধ্যাত্মিক আলস্যবশতঃ নিজের শ্রমের ভার পরের স্কন্ধে দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চান, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে একটী দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ে। আমরা এই মহা নগরের রাজপথে অনেকবার দেখিয়াছি, কয়েকটী শিশু একখানি ছোট টানাগাড়িতে বসিয়াছে, এবং একটী প্রাপ্ত বয়স্ক বালক সেই গাড়ির রজ্জু ধরিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শিশুগণ

তাহাদের ঝুমঝুমী লালা রসযুক্ত করিতে করিতে মনের আনন্দে চলিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতে এরূপ ঝুম্‌ঝুমী লালারসযুক্ত করিতে করিতে স্বর্গে যাইবার উপায় নাই। কোনও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে টানাগাড়ির রজ্জু দিয়া, নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে সেই গাড়ীতে বসিয়া যে ব্রহ্মধামে যাইব তাহার পথ নাই। নিজে শ্রম করিতেই হইবে, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মধন লাভ হইবে না, এই বিধাতার নিয়ম। অলস ও শ্রমকাতর ব্যক্তি প্রকৃত প্রার্থনা করিতে পারে না।

যেমন প্রত্যেক বৃক্ষের জন্ম ও বিকাশ দুইটী পদার্থের বিদ্যমানতার উপরে নির্ভর করে,—পৃথিবী হইতে রস ও আকাশ হইতে বায়ু ও উত্তাপ,—তেমনি প্রত্যেক মানবাত্মার উন্নতি ও বিকাশ দুইটী শক্তির বিদ্যমানতার উপরে নির্ভর করে, আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ। জগদীশ্বর সর্ব্ববিধ কার্য্যে আমাদিগকে তাঁহার সহচর অনুচর করিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"উঠ, উঠ, এই কাজটা করিতে হইবে, ত্বরায় আমার সহায় হও, তোমার সাধ্যে যাহা হয় তুমি কর, আমার যাহা করিবার আমি করিতেছি।" আমাদের ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি বিষয়েও তাঁহার সেই কথা। আবার ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ উভয়েরই প্রয়োজন, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ। সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ যদি দেখিতে চাও, তবে অবিশ্রান্ত ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা কর। কিন্তু প্রার্থনাতে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে নিজ নিজ জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের যাহা কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেকের নিজ সাধ্যে যাহা হয় তাহা সম্পাদন কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, তুমি কি সমাজ মধ্যে সর্ব্বত্যাগী পুরুষ সকল দেখিতে চাহিতেছ? তবে অগ্রে আপনাকে ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিয়া পরে প্রার্থনা কর, আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী পুরুষ সকলকে প্রেরণ কর। তুমি কি সমাজ মধ্যে আরও ভ্রাতৃপ্রেম দেখিতে চাহিতেছ? তবে নিজের হৃদয় পরীক্ষা কর, যদি সেখানে অক্ষমা থাকে, তাহাকে বিদায় কর, নিজে ক্ষমা কর, যাঁহাদিগকে বিরুদ্ধ চক্ষে দেখিতেছ তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার চেষ্টা কর, অপরের বিরোধ ভঞ্জনে ও প্রীতি স্থাপনে উৎসাহী হও, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা কর,—"আমাদিগকে ক্ষমাশীল কর, আমাদিগের মধ্যে শান্তি ও প্রীতিকে স্থাপন কর।" ইত্যাদি।

কিন্তু এই যে আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদের কথা বলা যাইতেছে, ইহার মধ্যে একটী বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আত্মোন্নতির জন্য আমার যাহা করিবার আছে, আমি তাহা করিবার জন্য দায়ী, এই ভাবের পথে একটী বিপদ আছে। এ জ্ঞান সহজেই জন্মিতে পারে যে আত্মোন্নতি সম্পূর্ণভাবে আমারই উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রহ্মকৃপার উপরে নির্ভর রাখিতে হইবে। এদেশীয় কৃষক যেমন হল-চালনা করিবার সময়ে নিশ্চয় জানে যে, দেবতা যদি প্রসন্ন না হন, সুসময়ে বর্ষার বারিধারা যদি না পাওয়া যায়, তবে তাহার ভূমি কর্ষণের শ্রম বৃথা; আমরা যেন সেইরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, ব্রহ্মকৃপার সহায়তা ভিন্ন আমাদের শ্রম কিছুই নহে। যেখানে পূর্ণ শ্রমের সঙ্গে পূর্ণ নির্ভর বাস করে, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব। ধন বল, বিদ্যা বল, সকল বিষয়েই যেমন শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, পরমার্থ লাভ সম্বন্ধেও তেমনি শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। শ্রমকাতর ও অসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ কোনও বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শ্রমকাতর ব্যক্তিগণ ধর্ম্মধন লাভেও সমর্থ হয় না। এই জন্যই উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"নায় মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন।" ধর্ম্মধন লাভ বিষয়ে কিরূপ শ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাও আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে ঋষিগণ অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীক-মিব পুত্তিকাঃ।" "পুত্তিকারা যে প্রকার শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের বল্মীক নির্ম্মাণ করে, তেমনি শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে পুত্তিকা-দিগের ন্যায় আমাদের শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম-যোগ। *

(প্রথম উপদেশ।)

"তদ্দুর্দ্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং,
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি।
উপনিষদ—

অর্থ—"সেই দুর্দ্দর্শ পুরুষ হৃদয়-গুহাতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি আধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া হর্ষ ও শোককে অতিক্রম করিয়া থাকেন।"

আমাদের হৃদয়ে যে হর্ষ শোকের তরঙ্গ সকল উত্থিত হয়, তাহাদের প্রকৃতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা মানব হৃদয়ের ভাব সকলের কয়েকটী স্বধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ভাবের প্রথম স্বধর্ম্ম এই যে, ইহা পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করি, তাহা হইলে কি এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হই না? এই জীবনে কতবার কত ভাব রাজত্ব করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কত বন্ধুতা, কত প্রণয় হইল আবার ভাঙ্গিয়া গেল! কত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে দুই চারি মাস অধিকার করিয়া থাকিল, আবার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিল! একজন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনের নবানুরাগের সময় সঙ্কল্প করিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিবেন, সেইভাবে কিছুকাল চলিলেন, আবার কালক্রমে সে ভাব জুড়াইয়া গেল, তিনি অপর দশ জনের ন্যায় সংসার-সেবাতেই রত হইলেন। ভাবের এই পরিবর্ত্তনশীলতার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক সময় প্রাতে যে ভাব হৃদয়ে প্রবল দেখি, সায়ংকালে আর তাহার চিহ্নও পাই না।

* ১৮৯৬ সাল ২৪শে মে রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

প্রাতঃকালে উপাসনা এমনি মিষ্ট লাগিল যে, দেহ মন প্রাণ ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন হইবার প্রবৃত্তি মনে প্রবল হইতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দিন অবসান হইতে না হইতে দেখি হৃদয়ের প্রেম শুকাইয়া গিয়াছে ; উপাসনার সে মধুরতা নাই ; সে আত্ম-সমর্পণের ভাবও আর নাই। রাত্রিকালে রজনীর অন্ধকারে একাকী শয়ন করিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, তাহার প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়াছি। মনে অনুতাপের উদয় হইতে লাগিল, এবং মনে এ প্রকার আবেগ উপস্থিত হইতে লাগিল, যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নিকটে পাইলে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। মনের আবেগে সঙ্কল্প করিলাম যে প্রাতে উঠিয়া প্রথমে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। কিন্তু পূর্ব্বাকাশে উষালোক প্রকাশ পাইতে না পাইতে, সেই মানসিক আবেগ নৈশ কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাতে সেই ব্যক্তিকে দেখিলাম,অথচ ক্ষমা চাহিবার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তি-গত ভাবে যেরূপ, সামাজিক ভাবেও সেইরূপ। জনসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও দেখা যায় যে, এক একটী ভাব এক এক সময়ে এক এক জাতির মনে প্রবল ভাবে রাজত্ব করিয়াছে। সেই ভাব বিশেষের উত্তেজনাতে বহু-সংখ্যক নরনারী উন্মাদ-রোগগ্রস্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু সে ভাব অধিক কাল থাকে নাই। সাগরের তরঙ্গ যেমন বায়ুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সাগর-গর্ভে বিলীন হয়, তেমনি সে ভাব-তরঙ্গ সমাজগর্ভে পুনরায় বিলীন হইয়াছে ; এবং কালক্রমে সমাজ মধ্যে আর সে ভাবের চিহ্নও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এইরূপ যতই চিন্তা করা যাইবে ততই দেখা যাইবে যে, আমাদের ভাব সকলের ন্যায় ক্ষণিক অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ অল্পই আছে।

ভাবের আর একটা স্বধর্ম্ম এই যে, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কেবল যে এক কালের এক প্রকার ভাব সময়ান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা নহে, একই ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহা আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক গৃহে লক্ষ্য করিতেছি। অপত্যবাৎসল্য বা দাম্পত্য প্রেম, এই দুইটীর ন্যায় আমাদের সুপরিচিত ভাব আর নাই। এই অপত্যবাৎসল্য ও দাম্পত্য

প্রেমে আমরা দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। কোনও সময়ে বা জননীর আচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার অপত্যবাৎসল্য নামমাত্র আছে। সন্তান কাঁদিতেছে, অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, জননী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও দেখিতেছেন না, বরং রোরুদ্যমান শিশুর হস্ত হইতে স্বীয় অঞ্চল আকর্ষণ পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইতে পারে, কবিরা যে মাতৃস্নেহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোথায়? তাহা কি সকলি অত্যুক্তি? কিন্তু আবার সময়ান্তরে দেখিতেছি, সেই জননী সেই শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন ও তাহাকে স্নেহের বন্যাতে ডুবাইয়া দিতেছেন। মাতৃস্নেহ উছলিয়া পড়িতেছে। দাম্পত্য প্রেমেও এইরূপ; এক সময়ে পতি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন সমীপাগতা পত্নীর কথা শুনিয়াও শুনিতেছেন না, এমন কি হয় ত "আঃ কি কর" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। সময়ান্তরে আবার সেই পত্নীকে ভালবাসার উচ্ছ্বাসে ডুবাইয়া দিতেছেন। ইহা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবনে ও অপরের জীবনে প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছেন। কেন যে ভাববিশেষের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ভাবস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, তাহা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি না। মাতৃস্নেহের যে উচ্ছ্বাসের কথা অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে, সে উচ্ছ্বাস যে কেন এক মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হয় এবং অপর মুহূর্ত্তে হয় না তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে অতি সামান্য কারণেই ঐ উচ্ছ্বাস অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। শিশু টলিতে টলিতে আসিয়া তাহার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ভাষাতে এমন একটী শব্দ উচ্চারণ করিল যাহা জননীর কর্ণে অতীব মিষ্ট বোধ হইল, অমনি সেই শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অথবা সে জননীর প্রতি নিজের ভালবাসা সূচক একটী কোনও সামান্য কার্য্য করিল, যাহাতে জননীর ভালবাসা একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিল। এ বিষয়ে ভাবের প্রকৃতি বায়ুতাড়িত জলের প্রকৃতি হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে। এই দেখিতেছি নদীবক্ষে জলরাশি ধীর, স্থির রহিয়াছে, দেখিতে দেখিতে কোন দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিল অমনি সেই ধীর, স্থির জলরাশি নৃত্য করিয়া

উঠিল। ভাবের এই জোয়ার ভাঁটাতে আমরা নিয়ত আন্দোলিত হইতেছি।

ভাবের তৃতীয় স্বধর্ম্ম ইহা সংক্রামক। ইহা সংস্পর্শ নিবন্ধন এক হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে গিয়া থাকে। ভাবের সংক্রামকতা যে কিরূপ আশ্চর্য্য তাহা স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। জগতে দশজনে মিলিয়া যত কিছু সদনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার সকলেরই মূলে ভাবের সংক্রামকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এক হৃদয়ের প্রেম, এক হৃদয়ের উৎসাহ, দশ হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জগতের মহাজনগণ এক এক জনে মানব সমাজে যে সুমহৎ বিপ্লব উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে এই ভাবের সংক্রামকতা। ইতি-বৃত্তে দেখিতে পাই, ভাবের এই সংক্রামকতা নিবন্ধন এক এক দেশের সমস্ত প্রজা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তুমুল রাষ্ট্রবিপ্লব বা সমাজবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ সালে এদেশে যে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মূলে এই ভ্রান্ত সংস্কার বিদ্যমান ছিল, যে ইংরাজগণ ছলে বলে এদেশের লোকের জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চান। এ প্রকার সংস্কারের কোনও মূল ছিল না। তথাপি এই সংস্কার ও তজ্জনিত বিদ্বেষবুদ্ধি দশ হৃদয় হইতে শত হৃদয়ে. শত হৃদয় হইতে সহস্র সহস্র হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল, ও দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। ইহা অপেক্ষা ভাবের সংক্রামকতার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ আর কি দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব আমরা দেখিতেছি ভাব ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন;—ভাব পরিবর্ত্তনশীল, ভাব হ্রাস-বৃদ্ধি-সহ ও ভাব সংক্রামক। জ্ঞান এ প্রকার নহে। জ্ঞানে পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই, সংক্রামকতা নাই। মনে কর তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে দুই প্রকার বাষ্পের সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। তুমি যত দিন বাতুল না হইতেছ, বা অন্য কোনও কারণে স্মৃতি-শক্তি-বিহীন না হইতেছ, ততদিন এ জ্ঞান কি প্রকারে তোমার চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে? বা অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? তুমি যদি মৃত্যু শয্যাতে শয়ানও হয় তথাপি এ জ্ঞান তোমার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে এবং তোমাকে সেই একই সাক্ষ্য দিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। জ্ঞান সংক্রমাকও নহে; অর্থাৎ সংস্পর্শ নিবন্ধন এক

চিত্ত হইতে অপর চিত্তে যায় না। জ্ঞান গুরু হইতে শিষ্যে গমন করে বটে, কিন্তু তাহা সংস্পর্শনিবন্ধন নহে, শিক্ষা-নিবন্ধন, অর্থাৎ শিষ্যকে জ্ঞানার্জ্জনী-বৃত্তি-নিচয়ের চালনা দ্বারা সে জ্ঞানকে লাভ করিতে হয়।

আমরা আত্মার বহির্ভাগ দ্বারা জগতকে ও জনসমাজকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি, অন্তর্ভাগ দ্বারা ধর্ম্মজগতকে ও পরমাত্মাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি। আমাদের অধিকাংশ হর্ষ ও বিষাদ সম্পূর্ণ বাহিরের পদার্থ। অনেক সময়ে দেখি বাহিরে যখন যেরূপ বায়ু উঠিতেছে, আমাদের হৃদয়সাগরেও তদনুরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে। আমরা নিরন্তর ভাবের দোলায় দুলিতেছি। শিশুরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ করে ও মহা দুঃখ ভোগ করে। একটী ভগ্ন কাচখণ্ডের জন্য এত শোক করে যে, রাজ্যেশ্বর রাজাদিগের সমগ্র রাজ্যটী বিনষ্ট হইলেও যেন তত দুঃখ হয় না। শিশুদিগের এই দুঃখ দেখিয়া প্রবীণেরা অনেক সময়ে কৌতুক করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানীদিগের দৃষ্টিতে জগতের অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর দুঃখও এইরূপ অতি সামান্য বিষয়ের জন্য দুঃখ বই আর কিছুই নহে। উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন—"বালকেরাই নিকৃষ্ট কামনার বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।" তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়ী লোককে এই বালকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের অধিকাংশ হর্ষ ও বিষাদ বালকের হর্ষ বিষাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-কামনা-সম্ভূত। এই সকল হর্ষ ও বিষাদ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল, হ্রাসবৃদ্ধিসহ ও সংক্রামক। এই সকল অস্থায়ী ভাব-তরঙ্গের আঘাতে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল হইতেছে। চিত্তের চঞ্চলতা-নিবন্ধন আমরা অনেক সময়ে জীবনের সুখও ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারিতেছি না, নিজ নিজ কর্ত্তব্যও সুচারুরূপে সাধন করিতে পারিতেছি না, এবং ঈশ্বরের শ্রবন মননেও সমুচিতরূপে নিযুক্ত হইতে পারিতেছি না। স্থিরচিত্ততা না হইলে জীবনের সুখটাও ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। যদি তুমি একটী কুকুরকে ডাকিয়া এক মুষ্টি অন্ন দেও, কিন্তু অদূরে ইষ্টক হস্তে একটী বালক দণ্ডায়মান থাকে, তবে কি সে স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই অন্ন মুষ্টি আহার করিতে পারে? ভয়জনিত উদ্বেগে তাহার আহারের সুখ অর্দ্ধেকেরও অধিক নষ্ট করিয়া ফেলে।

সেইরূপ জানিও প্রসন্ন ও সুস্থিরচিত্ত না হইলে জীবনের সুখও ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। জীবনের কর্ত্তব্যপালন ও ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ত পরের কথা। ঈশ্বরের উপাসনা মন্দিরের বায়ু প্রশান্ত ও সুস্নিগ্ধ। বাহিরের আন্দোলন ও তরঙ্গ সেখানে নাই, বাহিরের উত্তাপও সেখানে নাই। সেই স্থির ও প্রশান্ত মন্দিরে প্রেমালোকে তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। আত্মার সেই অন্তঃপুর অতি নির্জ্জন পুর। আমরা যতক্ষণ বহিঃপ্রাঙ্গণে থাকি ততক্ষণ হর্ষ শোকের আন্দোলন অনুভব করি। সে আন্দোলনকে অতিক্রম না করিলে সে পুরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

এই জন্যই উপনিষদকার ঋষিগণের ন্যায় সর্ব্বদেশের সাধুগণ এই চিন্তা করিয়াছেন যে, এই হর্ষ শোকের আন্দোলন ও আঘাতকে অতিক্রম করা যায় কিরূপে? এমন কি কোনও সঙ্কেত আছে যাহা একবার জানিলে এই ভাবের পরিবর্ত্তন, হ্রাস বৃদ্ধি ও সংক্রামকতার মধ্যে একটা স্থির ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী সঙ্কেত এই যে, আমাদের ঈশ্বর-প্রীতিকে সত্য জ্ঞানের ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববিষয়ে সত্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ-জনিত। জ্ঞান দুই প্রকার আছে,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান পরাধীন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বাধীন। যাহা তুমি শুনিয়া জানিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে সর্ব্বদাই পরের উপরে নির্ভর করিতে হয়। সর্ব্বদাই অমুক গুরুর মুখে শুনিয়াছি বা অমুক শাস্ত্রে আছে এইরূপ পরের দোহাই দিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতি অন্য প্রকার। "নেহাভিক্রম নাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে"—এ জ্ঞানে অভিক্রম বা নাশ নাই অথবা কোনও প্রত্যবায় নাই। তাহা তোমার নিজস্ব ধন, আপনার সম্পত্তি, সজন নির্জ্জনের সঙ্গী। ব্রহ্ম বিষয়ে যদি এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর বাহিরের হর্ষ শোকের তরঙ্গের উপরে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে হয় না। তখন ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবন অপর দশজনের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবনের সংস্পর্শের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তুমি যেখানেই থাক, তোমার অন্তরে এমন একটী কূপ রহিয়াছে, যাহা হইতে সুস্নিগ্ধ বারি সর্ব্বদাই উঠিতেছে। আমরা যতদিন এইরূপ স্বাধীন ও অক্ষয় ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে না পারি, ততদিন নিরাপদ নহি। ততদিন হর্ষ শোকের

বাহিরের তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হওয়া আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য। সকল বিষয়েই মানুষ স্বাধীন বস্তু চায়। এমন বিদ্যা লইয়া কে সন্তুষ্ট হয় যে বিদ্যার জন্য সর্ব্বদাই অপরের নিকট যাইতে হয়। যে বিদ্যা আত্মার জ্ঞান-সম্পত্তিকে বৃদ্ধি করে, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করে, বিচার শক্তিকে বিকাশ করে ও কার্য্যকুশলতাকে উৎপন্ন করে, তাহাই স্বাধীন বিদ্যা। নতুবা যে বিদ্যা দ্বারা মানবের বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত না হইয়া আরও জড়িত হয়, যদ্দ্বারা বিচার শক্তি সবল না হইয়া বরং খঞ্জ হইয়া যায়, যদ্দ্বারা সংসারের কোনও ইষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না,—যাহার প্রয়োগের জন্য সর্ব্বদাই গ্রন্থ বিশেষের বা মনুষ্য বিশেষের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা স্বাধীন বিদ্যা নহে। সেইরূপ যে ধন নিজে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারা যায় না, তাহা স্বাধীন ধন নহে। ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ। যে ধর্ম্ম আমার চরিত্রের সম্পত্তি, যাহা আমার জ্ঞানে, প্রেমে, অনুষ্ঠানে অনুপ্রবিষ্ট, যাহা আমার আত্মার ও জীবনের অন্ন পান স্বরূপ তাহাই আমার স্বাধীন বস্তু। এইরূপ ধর্ম্মই প্রার্থনীয়।

অধ্যাত্ম-যোগ।*

(দ্বিতীয় উপদেশ)

"তদ্দুর্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং,
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ শোকৌ জহাতি।"

উপনিষদঃ—

অর্থ—যে দুর্দর্শ পুরাতন পুরুষ হৃদয় গুহাতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ ও শোককে অতিক্রম করেন।

যে অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে হইবে, সে অধ্যাত্ম-যোগ বস্তুটা কি? প্রথম দেখা যাউক, আমরা যোগ বলিলে কি বুঝি। যোগের প্রথম অর্থ সন্নিকর্ষ বা সংস্পর্শ। দুইটী বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা যখন অন্তর্হিত হইতে থাকে, যেখানে দশ হস্ত পরিমাণ ব্যবধান ছিল, সেখানে যখন পাঁচ হস্ত হইল, সেই পাঁচ হস্ত যখন আবার দুই হস্ত হইল, দুই হস্ত অর্দ্ধ হস্ত হইল, তখন আমরা বলি উক্ত উভয় পদার্থ পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হইতেছে। অবশেষে সে ব্যবধানও যখন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আমরা বলিলাম, তাহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে যোগ তাহা এরূপ কোনও প্রকার দেশগত বা ব্যবধানগত যোগ নহে। যিনি দেশের প্রত্যেক অণুকে ও কালের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে আপনার সত্তার দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সূর্য্যালোকের প্রত্যেক কম্পনে এবং চিন্তা ও ভাবের প্রত্যেক ক্রিয়াতে সমান ভাবে বিরাজিত আছেন, তাঁহার আবার দূর ও নিকট কি? তাঁহার পক্ষে আবার ব্যবধান কি যাহা অন্তর্হিত হইবে? এই অর্থে কেহই এবং কিছুই

* ১৮৯৬ সাল ৩১শে মে রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

তাঁহা হইতে দূরে নয়; এবং সকলেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ও আমাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। যোগের আর এক প্রকার অর্থ এদেশে প্রচলিত আছে। তাহার অর্থ মিশ্রণ বা একীকরণ। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার" একটী প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীতের এই অংশে সেই যোগের ভাব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন দিগন্ত ব্যাপিয়া আকাশ আছে, একটী ঘটের মধ্যেও আকাশ আছে। ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহাও ঐ দিগন্তব্যাপী আকাশের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; একই বস্তু দুই স্থানে দুই ভাবে ব্যাপ্ত। এই মুহূর্ত্তে ঘটটী ভাঙ্গিয়া ফেল, ঘটাকাশ আর ঘটাকাশ রহিল না, আকাশে আকাশ মিশিয়া গেল, অনন্ত আকাশের সহিত ক্ষুদ্রাকাশ একীভূত হইল। যোগের দ্বিতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে এক বস্তু—শরীর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেল, দুই আত্মাতে এক হইয়া গেল। অনেকে ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ এই প্রকার বুঝিয়া থাকেন। গীতাকার বলিয়াছেন,—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।" হে ভারত! ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত, কেবল মধ্যাবস্থাতে ব্যক্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থাৎ মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পরাশি হইতে সমুত্থিত হইয়া ক্ষণকাল দৃশ্য থাকিয়া পরে বৃষ্টিধারা রূপে অবতীর্ণ হইয়া ধরিত্রীর গর্ত্তে ও নদনদী, সরোবর ও সাগরের জলরাশির মধ্যে পড়িয়া আবার বাষ্পাকার অবলম্বন করে, এই জগৎও তেমনি অদৃশ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া অদৃশ্যে বিলীন হইয়া থাকে। জীবাত্মাও এইরূপে পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। এই যোগের ভাবের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে জড়ীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। এরূপ যোগের কল্পনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা যেন মনে করেন, যে শরীরটা একটা শিশি ও আত্মাটা একটা আরক; যেমন শিশি হইতে আরকটা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তেমনি যেন শরীর হইতে আত্মাটাকে ঢালিয়া দেওয়া হইবে—আরকে আরক মিশিবে। কিন্তু অধ্যাত্ম-যোগের অর্থ এ প্রকার নহে।

অধ্যাত্ম-যোগ অর্থাৎ আত্মাকে অধিকার করিয়া বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে যোগ। শরীর সম্বন্ধে যেমন দূর, নিকট, সংযোগ, বিয়োগ প্রভৃতি শব্দ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ দূর

নিকট, সংযোগ ও বিয়োগ প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করি। ব্যক্তি বিশেষের নাম করিলে বলিতেছি—"উনি আমার কাছের লোক," কাহারও বা নাম হইলে বলিতেছি,—"উনি অনেক দূরের লোক।" কেবল যে এ প্রকার ভাষা ব্যবহার করিতেছি তাহা নহে, অন্তরেও মানুষে মানুষে দূরত্ব ও নৈকট্য সম্বন্ধে তারতম্য অনুভব করিতেছি। এ সংসারে অদ্যাবধি যত লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলের সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের ভাব কি সমান? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে তাহা নহে। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের এই ভাবের তারতম্য অতীব বিচিত্র। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যাহাদের সঙ্গে এক গ্রামে, এক ভবনে জন্মিয়াছি, বহুদিন এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাঁহারা সকলে আজ কোথায়? সে সকল বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও রমণী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারা এক জগতে, আর হয়ত আমরা আর এক জগতে। এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এ নহে যে, তাঁহারা আজ এ পৃথিবীতে নাই বা তাঁহারা অনেক দূরদেশে গিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা হয়ত এই দেশেই আছেন, হয়ত হাতের নিকটই আছেন, হয়ত সর্ব্বদা দেখিতেও পাই, কিন্তু চিন্তা, ভাব, রুচি, প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাতে কি প্রভেদই ঘটিয়াছে! সেই জন্যই বলিতেছি, যেন দুই দল লোক দুই স্বতন্ত্র রাজ্যে বাস করিতেছে। এই অর্থে বলিতে পারি, আমাদের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ যে জগতে বাস করিতেছেন, আমরা হয়ত আর সে জগতের অধিবাসী নহি; এতই দূরত্ব ঘটিয়াছে। আবার অপর দিকে এ কাহারা যাঁহারা আজ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন? ইঁহারা কোথায় জন্মিলেন, কোথায় বাড়িলেন, কি করিয়া এত নিকটে আসিলেন? ইঁহারা ত তবু নিকটে আছেন; দেশ বিদেশে সাগর পারে যে সকল নিকটের লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। তাঁহারা দূরে থাকিয়াও নিকটে। আবার বর্ত্তমান হইতে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখ যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনীগণ, শাক্য, যীশু, মহম্মদ,নানক, পল, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অতীতের অন্ধকারকে হরণ করিয়া উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বলিতেছেন। ইঁহাদের নাম

যখন স্মরণ কর, ইঁহাদের বিষয় যখন চিন্তা কর, ইঁহাদের উপদেশ সকল যখন পাঠ কর, তখন কি ইঁহাদিগকে আপনার লোক, নিকটের লোক বলিয়া অনুভব কর না? তখন কি ভাব ইঁহারা কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন? কি আহার করিতেন? কৃষ্ণবর্ণ কি গৌরবর্ণ ছিলেন? কোন্ ভাষায় কথা কহিতেন? ইত্যাদি। ইহার কিছুইত চিন্তা কর না। আত্মার আত্মীয়তা নামে একটা ব্যাপার আছে, যাহাতে দেশ, কাল, অশন বসন প্রভৃতির প্রভেদ ভুলাইয়া দেয়। একজন বিদেশীয় ও বিজাতীয়ের দৃষ্টান্ত দি। যীশুর নাম অনেকেই করিয়া থাকি, সত্য করিয়া বল, আজ যদি যীশু এই মুহূর্ত্তে এই সভা মধ্যে উপস্থিত হন, তোমরা সকলে কি বল,—"মাগো এ যে দেখি একটা য়িহুদী আসিয়া উপস্থিত হইল?" না সকলে বল "আসুন আসুন, বসুন বসুন, আপনি যে আমাদের পরমাত্মীয়, আমরা যে আপনাকে ভালবাসি, কি করিয়া ঈশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে হয় ও তাঁহার চরণে সমুদায় মন প্রাণ অর্পণ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে আর একবার বলুন।" দেখ আত্মাতে আত্মাতে কি আশ্চর্য্য নৈকট্য ও আত্মীয়তা জন্মিয়া থাকে। আত্মার এই নৈকট্য ও আত্মীয়তা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমাদিগের দেশে সন্ন্যাসী ও পরমহংসদিগের মধ্যে এক প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা যখন সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন স্বীয় স্বীয় নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীকে তাহার পুরাতন নাম ধাম বা জাতি বংশাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা শিষ্ট-রীতিবিরুদ্ধ। সন্ন্যাসিগণ সেরূপ প্রশ্নের উত্তর দেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া থাকেন। এজন্য এদেশে কেহই সন্ন্যাসীদিগের পিতা মাতার নাম বা জাতি কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন না। যদি বা কেহ অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসিগণ পিতার নাম বলিবার সময় নিজ দীক্ষাগুরুর নাম এবং বংশের নাম করিবার সময় নিজ সম্প্রদায়ের নাম করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই পরমহংসগণ মনে করেন যে, দীক্ষা গ্রহণান্তে তাঁহাদের পূর্ব্বকার অবিদ্যাময় জীবনের মৃত্যু হয় এবং নূতন জ্ঞানময় জীবনের জন্ম হয়। এই ভাব এক কালে বা এক দেশে আবদ্ধ নহে। মহাত্মা শাক্যসিংহের

জীবনের একটী ঘটনার কথা অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি নবালোক প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বীয় নবধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন, তখন এই নিয়ম করিলেন যে কোনও নগরের নিকটে গিয়া নগর-সন্নিকটস্থ কোনও বনে বা উদ্যানে সশিষ্যে বাস করিতেন। নগরবাসিগণ দলে দলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ আসিত। যদি আগন্তুকদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার ও শিষ্যগণের আহারাদির বন্দোবস্ত করিত ভালই, নতুবা তিনি স্বয়ং সশিষ্যে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেন। একবার সিদ্ধার্থ সশিষ্যে নিজ পিতার রাজধানীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এক দিন তাঁহার পিতা সংবাদ পাইলেন যে, সিদ্ধার্থ সশিষ্যে তাঁহারই প্রজাগণের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া রাজা আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন এবং শাক্যসিংহকে এপ্রকার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। পরে নিজে আসিয়া বুদ্ধকে কহিলেন, "হে পুত্র, তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে বংশে কে কবে মুষ্টি-ভিক্ষার দ্বারা প্রাণ ধারণ করিয়াছে?" বুদ্ধ কহিলেন;—"মহারাজ! আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে বংশে সকলেই ভিক্ষুক।" ইহাতে রাজা শুদ্ধোদন অতিশয় কুপিত হইলেন। তখন বুদ্ধ বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধবংশের কথাই বলিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর জীবনেও এইরূপ একটী ঘটনা আছে। একবার তিনি শিষ্যসমভিব্যাহারে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন আসিয়া বলিল,—"আপনার মাতা ও ভাই ভগিনীগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কে আমার মা, কে আমার ভাই ভগিনী, ইহারাই আমার মা ও আমার ভাই ভগিনী" এই বলিয়া সম্মুখস্থ শিষ্যমণ্ডলীকে দেখাইয়া দিলেন। এ সকল কথা আপাততঃ হৃদয়ের কঠোরতার প্রকাশক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। আত্মাতে আত্মাতে এক প্রকার যোগ স্থাপিত হয়, যাহা রক্তের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না।

কিন্তু যে আধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহা আরও গভীর বস্তু। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমি

স্বরূপে লক্ষ্য করা, প্রেমদ্বারা তাঁহাকে প্রেমাস্পদ রূপে অবলম্বন করা ও ইচ্ছাদ্বারা তাঁহাকে অধিপতিরূপে বরণ করাই অধ্যাত্ম-যোগ। আর একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। আত্ম-জ্ঞানের মূলেই পরমাত্ম-জ্ঞান নিহিত। আত্মার আশ্রয় ভূমি যে তিনি তাঁহার জ্ঞানকে পরিহার করিয়া আত্ম-জ্ঞান সম্ভব নহে। পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিয়া আত্মার যে জ্ঞান তাহা আংশিক জ্ঞান এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান শব্দের বাচ্য নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে এ বিষয়ের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন মানুষ কোনও দুন্দুভির শব্দ শ্রবণ করে, তখন সেই শব্দমাত্রের জ্ঞানকে কি তাহার পূর্ণজ্ঞান বলা যাইতে পারে? তাহা পারে না। যখন সে স্বচক্ষে দুন্দুভিকে ও সেই সঙ্গে বাদককে ও বাদন-প্রক্রিয়াকে দর্শন করে, তখনি তাহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অথবা মনে কর যে ব্যক্তি কেবল দূর হইতে ইন্দ্রধনু দেখিতেছে, ও তাহার বিচিত্র বর্ণ দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছে, কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছু জানে না, সে কি ইন্দ্রধনুকে জানে? বৃষ্টিধারার বিন্দু সকলের মধ্যে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কিরূপ বিচিত্র বর্ণ উৎপন্ন করে, যখন সে তাহা প্রত্যক্ষ করে, কাচখণ্ডে সূর্য্য কিরণ ধরিয়া দেখে, এবং সেই সঙ্গে মেঘ ও বৃষ্টির প্রকৃতি এবং সূর্য্যকিরণের স্বভাব ও কার্য্যের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ। যে আত্মা জগতরূপ বহিঃপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছে, অভিনয়কারী নটের ন্যায় নানা বেশ ধারণ করিতেছে, হর্ষ শোকের আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকুলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, ইহাকেই যদি আত্মা বলিয়া জান, এই জীবনকেই যদি একমাত্র জীবন মনে কর, ইহার অতিরিক্ত যদি কিছু না জান, তবে আত্মাকে জানাই হইল না। যেমন ইন্দ্রধনুকে প্রকৃত ভাবে জানিবার জন্য মেঘে ও বৃষ্টিতে প্রবেশ করিতে হয়, সূর্য্য-কিরণের প্রকৃতির মধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়, তেমনি আত্মাকে প্রকৃতভাবে জানিতে হইলে পরমাত্ম-স্বরূপে নিমগ্ন হইতে হয়। যখন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই, যে পরমাত্মা হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া চিন্তা করিবার যো নাই, এককে দেখিতে গেলেই অপরকে দেখিতে হয়, এককে

ভাবিতে গেলেই অপরকে ভাবিতে হয়, যখন বুঝিতে পারি যে, এই জীবাত্মা জগতের দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার দিকে অনন্তের সহিত মিশ্রিত, তখন অধ্যাত্ম-যোগের প্রথম সোপানে পদার্পণ করি।

সত্য জ্ঞান ভিত্তি স্থাপন করিলে প্রেম তদুপরি কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার মঙ্গলভাব প্রেমের উপজীব্য পদার্থ। সেই মঙ্গলভাবের স্মরণে, চিন্তনে ও কীর্ত্তনে যখন সমগ্র মনের গতি তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহারই নাম ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"মনো গতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ।" অর্থাৎ গঙ্গার জলরাশি যেমন অবিচ্ছিন্ন গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত, তেমনি মনের গতি যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ও স্বাভাবিকরূপে তাঁহার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা ভক্তি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই ভক্তি অধ্যাত্ম-যোগের দ্বিতীয় সোপান।

জ্ঞান যাঁহাকে পরম সত্য বলিয়া ধরিল, প্রেম তাঁহাকে প্রেমাস্পদ বলিয়া আলিঙ্গন করিল, এখানেও অধ্যাত্ম-যোগের পরিসমাপ্তি হইল না। তাঁহার সহিত আমাদের আর এক যোগ সম্ভব। তাহা ইচ্ছার যোগ। প্রেমের এই এক আশ্চর্য্য মহিমা যে, ইহা মানুষকে স্বাধীন রাখিয়াও পরাধীন করে। মানবাত্মা অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একীভূত করে, এবং তাঁহাতেই আনন্দ লাভ করে। যতক্ষণ প্রীতি হৃদয়ে পদার্পণ করে না, ততক্ষণ বাধ্যতা ঘোর ভার-স্বরূপ বোধ হয়। যে শাসনশক্তি বাহির হইতে আসে ও প্রেমহীন হৃদয়কে শাসন করে, তাহাতে ঘোর দাসত্ব, কিন্তু যে শাসনশক্তি প্রেম হইতে জন্মগ্রহণ করে, ও অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ভগবদিচ্ছা ধর্ম্মনিয়মরূপে মানবাত্মাতে নিহিত রহিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক আত্মাকে অধীন করিতে চাহিতেছে। প্রীতির অভাবে আমাদিগকে কতবার এই বলিয়া দুঃখ করিতে হইতেছে,—জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য-ধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ—হায় হায়! ধর্ম্মকে জানি অথচ তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্মকে জানি অথচ তাহা হইতে নিবৃত্তি হয় না। এমন কেন হয়? বিশ্বাস ও প্রেমের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে ও তাঁহাতে অকপট প্রীতি স্থাপন করিলে

আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে। আমরা অনেক সময় এই ইচ্ছাকে জানিয়াও তাঁহার অধীন হইতে পারি না। যতই আমাদের প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে, ততই তাহার সহিত আমাদের যোগ গাঢ়তর হইতে থাকে। জ্ঞান যাহাকে সত্যং বলিয়া ধরিয়াছিল, প্রেম তাহাকে শিবং বলিয়া ধরিল, অবশেষে ইচ্ছা তাঁহাকে সুন্দরং অর্থাৎ পবিত্র স্বরূপ প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা এই তিন লইয়াই মানবাত্মা। সত্যং শিবং সুন্দরং এই ত্রি-স্বরূপাত্মক মন্ত্রই যোগের প্রধান মন্ত্র। এই ত্রিবিধ যোগে আমরা যখন তাঁহার সহিত সংযুক্ত হই, তখন অধ্যাত্ম যোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর করুন এই ত্রিবিধ যোগে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি।

দিবীব চক্ষুরাততং।*

তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং!—ঋগ্বেদ।

অর্থ—"চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে তেমনি পণ্ডিত-গণও সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরম পদকে দর্শন করিয়া থাকেন।"—

পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রটী এতদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ। প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। এই মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা একবার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি। চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে যেরূপে দেখে, সাধকগণ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরম পদকে সেইভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বিষয়ে মানুষের যেমন নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মে, ব্রহ্মবিষয়েও জ্ঞানিগণের সেইরূপ নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। যে ঋষি পূর্ব্বোক্ত বচন রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরে কি প্রকার জ্ঞানের ভাব বিদ্যমান ছিল?

আমাদের এ দেশের দর্শনকারগণ তিন প্রকার প্রমাণকে জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা আপ্ত বচন। পদার্থ বিশেষ ইন্দ্রিয়গোচর হইলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; জ্ঞাত বিষয়কে হেতুস্বরূপ করিয়া অজ্ঞাত বিষয়ের যে জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, তাহা অনুমান-লব্ধ জ্ঞান; বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া যে জ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়, তাহা আপ্তবাক্য-জনিত জ্ঞান। আপ্তবাক্য বলিতে এদেশে বেদাদি শাস্ত্রই বুঝাইয়া থাকে। যদিও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আপ্তবাক্যও অনুমান মধ্যে আসিয়া পড়ে, তথাপি এ দেশীয় দার্শনিকগণ আপ্তবাক্যকে

* ১৮৯৬ সাল ৩১শে মে রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

একটী প্রমাণ ও জ্ঞানের একটী দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম। ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, বিবিধ প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানই সাক্ষাৎ জ্ঞান, অপর দ্বিবিধ প্রমাণলব্ধ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমাদের যে ঈশ্বরজ্ঞান তাহা কোন জাতীয় জ্ঞান। জ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন,—"আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান অনুমানলব্ধ জ্ঞান, সৃষ্টি দর্শনে স্রষ্টার অনুমান মাত্র।" এ কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"অনুমান প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে বিচার করিলে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।" অতএব শব্দ বা আপ্তবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। ঈশ্বর আছেন, একথা আমরা কেন বলি ? কারণ ঋষিগণ যোগনেত্রে তাঁহাকে দেখিয়া বেদাদিশাস্ত্রে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, যে তিনি আছেন। যদি কেহ বলেন ঋষিগণ যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, আমরা কেন দেখিব না ? তাহার উত্তরে এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বলিবেন—"তোমাদের যখন যোগনেত্র ফুটিবে, তখন তোমারাও দেখিবে। একদিকে দেখিতে গেলে এ সকল কথা বড় নৈরাশ্যজনক। উভয় মতেই বলিতেছে,—"হে মানব তুমি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে জানিতে পার না।" কিন্তু যে ঋষি পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার মনে ব্রহ্মজ্ঞানের আর একপ্রকার ভাব ছিল। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের যে জ্ঞান, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থজ্ঞানের ন্যায় সাক্ষাৎ ও উজ্জ্বল জ্ঞান। "দিবীব চক্ষুরাততং"—চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে যেরূপে দেখে ঈশ্বরকে সেইরূপ উজ্জ্বল ও সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে হইবে। নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমাদের আত্মজ্ঞানই কেবল সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের জ্ঞান যে সাক্ষাৎ জ্ঞান শব্দে বাচ্য তাহাও আত্ম-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া; আমরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা পদার্থ সকলের গুণাবলীকেই জানি; তাহাদের স্বরূপ বিষয়ে কিছুই অবগত হইতে পারি না। আবার গুণাবলী যাহা জানি তাহাও আপেক্ষিক অর্থাৎ স্থল ও অবস্থা বিশেষের সঙ্গে তাহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এইরূপে বিচার করিলেই একমাত্র আত্মজ্ঞানকেই কেবল সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে ঈশ্বর-জ্ঞান কি প্রকারে সাক্ষাৎ জ্ঞান শব্দে বাচ্য হইতে পারে ? তদুত্তরে বক্তব্য এই আত্মজ্ঞানের মধ্যেই পরমাত্মজ্ঞান

নিহিত। যেমন সীমাবিশিষ্ট প্রত্যেক জড়পদার্থের জ্ঞানের মধ্যে দেশের জ্ঞান নিহিত অর্থাৎ দেশের জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া জড়পদার্থের জ্ঞান সম্ভব নহে; যেমন কালের জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া কোনও ঘটনা বিশেষের জ্ঞান সম্ভব নহে, তেমনি পরমাত্ম-জ্ঞানকে মন হইতে বাদ দিয়া আত্মজ্ঞান সম্ভব নহে। যেমন দেশ ও কালের জ্ঞানকে ভূমিরূপে অগ্রে পাতিয়া তবে তদুপরি সমুদায় পদার্থ-জ্ঞান ও ঘটনা-জ্ঞানকে অঙ্কিত করিতে হয়, তেমনি পরমাত্ম-জ্ঞানকে অগ্রে ভূমিরূপে পাতিয়া তবে আত্মজ্ঞানকে ধারণা করিতে হয়। যে জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, সেই জ্ঞানক্রিয়া দ্বারাই আত্মার প্রতিষ্ঠা ভূমি যে পরমাত্মা তাঁহাকেও জানা যায়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ইহার তাবত অবস্থা ও ঘটনা, এতৎ সম্বন্ধে তিনটী ভাবের একটী মাত্র সত্য হইতে পারে। হয় বল, সকলে এক সত্যেরই বিকাশ-মাত্র, না হয় বল তাহারা প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্রভাবে সত্য, নতুবা বল কোনটীই সত্য নহে; সকলগুলিই স্বপ্ন। যদি সকলগুলিই স্বপ্ন হয়, তবে তাহারা কাহার স্বপ্ন? এ স্বপ্নের দ্রষ্টাও কি স্বপ্নময়? এ মত অতিশয় হাস্যজনক। যদি বল প্রত্যেকটীই সত্য, তাহাও বলিতে পার না, কারণ যাহা সত্য, তাহা স্বতন্ত্র ও নিত্য। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও বিষয়ই নিত্য নহে, স্বতন্ত্র নহে। তাহারা বিকার ও পরিবর্তনশীল। তবে বলিতে হইতেছে মূলে এক সত্য আছে তাহার ভাব যদি অগ্রে হৃদয়ে না লও, তবে অপর সকলের তাৎপর্য্য কিছুই থাকে না। যেমন গণনা প্রক্রিয়াতে লক্ষ শূন্য যোগ করিলে তাহার কোনও মূল্য থাকে না, কিন্তু অগ্রে এক ধর, পরে শূন্য যোগ কর প্রত্যেক শূন্যের মূল্য দেখিবে, তেমনি জগতের জ্ঞানসমষ্টির অগ্রে মূলীভূত সত্যরূপে সেই একেকে ধর তৎপরে তদনুসারী যত জ্ঞান আরোপ করিবে সকলই তাৎপর্য্যশালী হইবে।

"দিবীব চক্ষুরাততং" এই উক্তিটীকে আমরা আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। চক্ষুর দর্শনক্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি যে, দর্শনক্রিয়ার মধ্যে দ্রষ্টব্য পদার্থ ও দ্রষ্টা যে চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের সহিত কি আশ্চর্য্য উপযোগিতা আছে? দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ এমনি, তাহার আলোক রেখার প্রসারণের রীতি এমনি,

যে, তাহা অদ্ভুতরূপে চক্ষুরই উপযোগী, আবার চক্ষের গঠন ও প্রকৃতি এমনি যে তাহা পদার্থ দর্শনের উপযোগী। প্রত্যেক দর্শনক্রিয়াতেই চক্ষু ও দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। তেমনই আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যেও আশ্চর্য্য উপযোগিতা আছে। জীবাত্মা তাঁহারই জন্য তিনিও জীবাত্মার জন্য; এবং তাঁহাকে জানিলেই আত্মা তাঁহার সহিত অভেদ্যযোগে আবদ্ধ হয়।

আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে চক্ষু যে ভাবে দেখে, সেইভাবে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে; এ উপদেশ বড় সামান্য নহে। একবার চিন্তা কর, কোনও বস্তুকে চক্ষুর দ্বারা একবার দেখিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। মনে কর, তুমি স্বীয় বাসভবন করিবার জন্য একটী ভবন ক্রয় করিয়াছ। তুমি সেই ভবনে বাস করিতে যাইতেছ। গিয়া দেখিলে যে, সে ভবনের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। সে বৃক্ষটী দেখার পর আর কি তুমি এমনভাবে সে প্রাঙ্গণে গতায়াত করিতে পার, যেন বৃক্ষটী তথায় নাই? তাহা কখনই পার না, গতায়াত করিবার সময় তোমাকে বৃক্ষটী পরিহার করিয়া চলিতে হয়,যেন তাহার দেহে তোমার মস্তক আহত না হয়। তৎপরে তুমি যখন অন্ধকার রাত্রে সেই ভবনে প্রবেশ কর, হাতড়াইয়া দেখ, বৃক্ষটী কোথায় আছে। অর্থাৎ সেই প্রত্যক্ষ-জনিত জ্ঞান তোমার স্মৃতিতেও প্রবেশ করে। এইরূপে সেই জ্ঞান তোমার আত্মার স্থায়ী জ্ঞান-সম্পত্তির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তৎপরে তুমি যখন রাত্রে শয়ন করিয়া সেই ভবনের নানা-প্রকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন সে বৃক্ষটীকে মন হইতে ফেলিয়া দিয়া চিন্তা করিতে পার না। তাহা তোমার মনের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া দেখি বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য বহুদূর গমন করিতে হইবে না। এই যে ব্রহ্ম-মন্দিরে সকলে উপাসনার্থ সমবেত হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কোন্ জ্ঞান, কোন্ বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা কি সকলে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? দেশ বলশালী ও শাসনক্ষম রাজাদিগের দ্বারা শাসিত, এ বিশ্বাস অন্তরে নিহিত না থাকিলে কি কেহ এখানে এরূপে সমবেত হইতে

পারিতেন ? বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যেই যদি সংবাদ আসে যে, সিপাহিগণ আবার বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগকে হত্যা করিতেছে এবং বঙ্গদেশ জয় করিয়া কলিকাতার অভিমুখে আসিতেছে, তাহা হইলে কি আগামী রবিবারে এত লোক এই মন্দিরে উপস্থিত হইবেন ? দেখুন, তবে বর্ত্তমান রাজাদিগের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব কেমন আমাদের কার্য্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতেছে !

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দেখে, সেরূপ উজ্জ্বলভাবে যদি আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে কি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে না ? আমরা তাহাতে সত্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি কি না তাহা তিনটী প্রশ্নের দ্বারা বিচার করা যাইতে পারে। প্রথম—আমরা তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি কি না ? দ্বিতীয়—তাঁহার বিধাতৃত্বের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর আছে কি না ? তৃতীয়—তাঁহাকে নিয়ন্তা ও অধিপতিরূপে অনুভব করি কি না ?

আমরা তাঁহাকে কিরূপ অনুভব করিতেছি ? একজন তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে দূরে দেখিতে পারে। তিনি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার অপর পার্শ্বে আছেন, এরূপ ভাবিতে পারে। যন্ত্র-নির্ম্মাতা যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা চালাইয়া দিয়া নিজে দূরে যায়, তেমনি তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে চালাইয়া দিয়া দূরে গিয়াছেন, ইহা কেহ মনে করিতে পারে। আমরা কি তাঁহাকে সেইরূপ দূরস্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি, অথবা তাঁহাকে নিকটস্থ ও আত্মার আশ্রয়-ভূমি বলিয়া অনুভব করিতেছি ? জীবনের সুখ দুঃখ পাপ প্রলোভনের মধ্যে যদি সেই পরমাশ্রয় পরমেশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতে না পারা যায়, আত্মাকে তাঁহার ক্রোড়ে নিহিত বলিয়া না দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলি বা যাহা কিছু শুনি সকলি বৃথা বোধ হয়। ফলতঃ তাঁহার সহিত এইরূপ নৈকট্য স্থাপনের উদ্দেশেই দর্শনাদি রচনা ও শাস্ত্রাদির বিচার, যদি সেই ফলই না ফলে, তবে দর্শনের বিচার ও শাস্ত্রের আলোচনা সকলি বৃথা। এক জন যদি সমুদায় রাগ রাগিণীর মাত্রা ও স্বরলিপি প্রভৃতি জানে কিন্তু নিজে কণ্ঠে একটীও রাগ বা রাগিণী গাইতে না জানে, তবে তাহার স্বর-

লিপি জানা যেমন বৃথা, তেমনি ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকিয়াও যদি তাঁহার নৈকট্য অনুভব না করা যায়, যদি সেই নৈকট্যজ্ঞান আমাদের চিন্তা ও কার্য্যে প্রবেশ না করে, তবে সে জ্ঞানে ফল কি? অথচ ইহা কি লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় না যে আমরা অনেক সময়েই তাঁহার সান্নিধ্য বিস্মৃত হইয়া থাকি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি সৃষ্টির রচনা-প্রণালীতে, মানবের ইতিবৃত্তে ও নিজ নিজ জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই? বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে তাঁহার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ—অদ্বৈতভাবাত্মক জ্ঞানের বহুল প্রচার হওয়াতে তাঁহাকে জ্ঞানক্রিয়াসম্পন্ন পুরুষরূপে ধারণা করার ভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিরাজ্যে বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার মত প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাকে বিধাতারূপে দেখা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অথচ তাঁহার মঙ্গলভাবই প্রেমের উপজীব্য বস্তু। তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতারূপে প্রতীতি না করিলে প্রেম তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, আমরা কি তাঁহার নিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাস করি? আমরা কি সত্য সত্যই তাঁহাকে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদরূপে দর্শন করিয়া থাকি? অর্থাৎ আমরা কি মনে করি যে, দ্বিতল বা ত্রিতল প্রাসাদ হইতে লম্ফ দিলে যেমন ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া অনিবার্য্য, অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইলে যেমন ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হওয়া অনিবার্য্য, জলরাশি ঢালিয়া দিলে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হওয়া যেমন অনিবার্য্য, তেমনি এ জগতে সত্যের ও ধর্ম্মের জয় হওয়া অনিবার্য্য। ধর্ম্মে এরূপ সুদৃঢ় প্রতীতি স্থাপন করিতে না পারিলে তাঁহাকে নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। জগতে অনেক প্রকার নাস্তিক আছে,কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাস্তিক সেই যে অসত্য, অধর্ম্ম বা অসাধুতাচরণ করিয়া জয়লাভ করিবার আশা করে; কারণ সে আপনার ব্যবহার দ্বারা বলে, "ঈশ্বর বলিয়া কোথাও কিছু নাই, এ পৃথিবীতে জয় পরাজয় কেবল মানুষের চাতুরীর খেলা মাত্র।"

ঈশ্বর-নিকটে, অন্তরে বাহিরে, তিনি মঙ্গলময় বিধাতা ও তিনি ধর্ম্মের নিয়ন্তা এই তিনটী বিশ্বাসের সুদৃঢ় কস্ত না হইলে ঈশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম-

যোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায় না; ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিই স্থাপিত হয় না। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জীবনের যত কিছু দুর্গতি তাহার মূলে এই তিনটীর অভাব; আমরা তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করি না, তাঁহার বিধাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না এবং তাঁহার নিয়ন্তৃত্বের উপরে নির্ভর করিতে পারি না। এইগুলির দ্বারাই জ্ঞান সফলতা প্রাপ্ত হয়। করুণাময় বিধাতা করুন আমরা এই তিনটীকে জীবনে লাভ করিয়া প্রকৃত আস্তিক নামের উপযুক্ত হইতে পারি।

ধর্ম্মের বহিঃপুর ও অন্তঃপুর।*

আত্ম-ক্রীড়ঃ আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্—উপনিষদ।

অর্থ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন পরমাত্মাতে রমণ করেন ও ক্রিয়াবান্ হয়েন।

সকল বিষয়েরই একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর, একটা বাহির পিঠ ও একটা ভিতর পিঠ আছে। যেমন রঙ্গ-ভূমিতে একটা সাজঘর থাকে, যেখানে নটগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্য সমাধা করিবার জন্য সজ্জিত হয়, আবার একটা বহিঃপ্রাঙ্গণ থাকে যেখানে দর্শকবৃন্দ সমাসীন হইয়া অভিনয় কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন, তেমনি এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকল পদার্থের ও সকল ঘটনারই একটা সাজঘরের দিক ও একটা দর্শকের দিক আছে। মনে কর তুমি কোনও রঙ্গভূমির দর্শক বৃন্দের মধ্যে সমাসীন হইয়া অভিনয় কার্য্য দর্শন করিতেছ। তুমি দেখিতেছ যে শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের পূর্ব্বে কণ্বমুনি একাকী স্নানান্তে বনমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া স্বগত কিছু বলিতেছেন। চিত্রকরের শিল্পচাতুরী বশতঃ সেই চিত্রপটস্থিত বন তোমার চক্ষে প্রকৃত অরণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সেই পলিত-কেশ শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধকে তোমার প্রকৃত কণ্বমুনি বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মিতেছে। কে সে ব্যক্তি? এরূপ শুক্ল কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু কিরূপে হইল, এরূপ ভ্রান্তি কিরূপে উৎপাদন করিতেছে? তাহার কিছুই তুমি জান না। কিন্তু যে ব্যক্তি সাজঘরে বসিয়া ঐ সকল নটকে স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া দিতেছে, সে ব্যক্তি উহাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, ও প্রত্যেককে সজ্জিত করিবার প্রণালী প্রভৃতি সমুদায় জানে। এই ব্রহ্মাণ্ডে কি অনেক পরিমাণে এই প্রকার ব্যাপার চলিতেছে না? মনে কর একজন বর্ণজ্ঞান-বিহীন সরলমতি কৃষক একদিন অপরাহ্নে সমুদিত ইন্দ্র-

---

* ১৮৯৬ সাল ২৮শে জুন রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

ধনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার সমুজ্জ্বল ও বিচিত্র ও বর্ণ-বিন্যাস দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া যাইতেছে। তাহার বোধ হইতেছে যে ঐ ধনুর এক কোটি যেন কিয়দ্দূরে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সে সাজঘরের সংবাদ কিছু জানে না। কিরূপে যে মেঘমুক্ত জলকণার মধ্যে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া ঐরূপ বিচিত্র বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে তাহা সে অবগত নহে। তাহার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির পক্ষে উহা সত্য ধনু বলিয়াই বোধ হইতেছে। কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ যেন প্রকৃতির সাজঘরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাজঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন ঐ ধনু কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, উহার গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি কি আছে, সুতরাং তাঁহারা অন্তঃপুরের সংবাদ কিয়ৎ পরিমাণে দিতে সমর্থ।

এক দিকে দেখিতে গেলে একথা বলা অতীব ধৃষ্টতার কার্য্য যে কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি প্রকৃতির সাজঘরে বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের অজ্ঞতার জ্ঞান বরং দিন দিন অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইতেছে। আলোক যতই উজ্জ্বল হয় কৃষ্ণবর্ণ রেখাটি যেমন ততই অধিকতর উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি জ্ঞানালোকের উজ্জ্বলতা অজ্ঞতার কৃষ্ণবর্ণ রেখাটীকে যেন আরও অধিকতর উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দিতেছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান যত জটিল সমস্যার সদুত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জটিল ও অমীমাংসিত সমস্যাকে চিন্তাপথে উপস্থিত করিয়াছে। সকল বিভাগেই বিজ্ঞান এমন সকল প্রশ্ন দেখিতেছে, যাহার সদুত্তর দেওয়া ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব মানব বিধাতার সাজঘরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে একথা বলিলে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা দোষে দোষী হইতে হয়। আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে পারি না। তবে সামান্য প্রাকৃতিক পদার্থের জ্ঞানেরও যে একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে।

যেমন প্রকৃতি রাজ্যে একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর দেখা যাইতেছে, তেমনি মানব-মনেরও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। ঐ যে বাহিরের মানুষ দেখিতেছ, যে অন্ন পান গ্রহণ করিতেছে, হর্ষ বিষাদ

ভোগ করিতেছে, এ জগতে মিত্রতা শত্রুতা করিতেছে, অর্থোপার্জ্জন, পরিবার পালন, বিষয় বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি করিতেছে, ওটা মানুষের বহিঃপুর বা বাহিরের পিঠ; ভিতর পিঠে ও মানুষটা কিরূপ তাহা কে জানে? ঐ সকল কার্য্যের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি, কোন্ কোন্ ভাব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কে জানে? হৃদয়ের গভীরতম অন্তরতম তলে যেসকল উৎস লুক্কায়িত আছে, এবং যে সকল উৎস হইতে ঐ বিচিত্র বর্ণের কার্য্য সকল উৎসারিত হইতেছে, তাহাদের প্রকৃতি কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? যেমন কতিপয় বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতির সাজঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অন্তঃপুরের সংবাদ কিয়ৎ পরিমাণে দিতে পারেন, তেমনি মনো-বিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকগণ কিয়ৎ পরিমাণে মানব মনের অন্তঃপুরের সংবাদ দিতে সমর্থ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করে,তাহা-দিগকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, পরিমাণ করা যায়, ওজন করা যায়, সুতরাং সে সকল গবেষণার ফলসম্বন্ধে অধিক মতদ্বৈধ হইতে পারে না। যতই আমরা প্রাকৃতিক রাজ্য পরিহার করিয়া অন্তররাজ্যে প্রবেশ করি, এবং সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় মানসিক প্রবৃত্তি ও ভাব সকলকে গবেষণার অধীন করি, ততই নিঃসন্দিগ্ধ ফলে উপনীত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। এই কারণে মনোবিজ্ঞানবিৎ দার্শনিকগণ অদ্যাপি ঐকমত্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্দেশে ও অপরাপর দেশে দার্শনিকদিগের বাদ প্রতিবাদে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহুকাল হইল এদেশে শঙ্কর, কপিল, চার্ব্বাক প্রভৃতি দর্শনকারগণ যে সকল মত অবলম্বন করিয়া বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি ইউরোপখণ্ডে সেই সকল মতের অনুরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তাহা হইলেও একথা স্বীকার করিতে হয় যে এই সকল মনস্তত্ত্ব আলোচনার ফলস্বরূপ, মানবাত্মার স্বরূপ ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে কতিপয় গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা মানব মনের অন্তঃপুরের সংবাদ কিছু জানেন একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাও যৎসামান্য।

এইরূপ শিল্প-সাহিত্যাদির ও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। মনে কর তুমি কোনও সুচিত্রকরের চিত্রিত একখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া আছ; দেখিতে দেখিতে তোমার মন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; তোমার বোধ হইতেছে দূরে দুইটী পাহাড় দণ্ডায়মান; তাহার মস্তকে নবোদিত সূর্য্যের কিরণ জাল পড়িয়াছে; কিন্তু পাদদেশে এখনও নৈশ অন্ধকারের ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে; সম্মুখে একটী বহুদূর বিস্তৃত হ্রদ, তাহার নিবাত নিষ্কম্প জলরাশিতে তীরবর্ত্তী তরুরাজি প্রতিফলিত হইতেছে। অথচ সেই সমুদায় ব্যাপার একই পটের এক পৃষ্ঠে অঙ্কিত। তুমি ছবি দেখিতেছ ও মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু অন্তঃপুরের সংবাদ কিছু জান না। যে অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্যের গুণে ঐ অদ্ভুত ভ্রান্তি উৎপাদিত হইতেছে, তাহার কোনও জ্ঞান তোমার নাই। কতিপয় শিল্পীই জানেন, কি প্রকারে ঐরূপ ভ্রান্তি উৎপাদিত হইয়াছে; আলো ও ছায়ার কিরূপ সমাবেশ নিবন্ধন ঐরূপ কোনওটী দূরে, কোনওটী নিকটে, কোনওটী উচ্চ, কোনওটী নিচু দেখাইতেছে। তাঁহারা যেন চিত্র-বিদ্যার সাজঘরে প্রবেশ করিয়াছেন।

সংগীত সম্বন্ধেও এইরূপ। মনে কর, কোনও স্থানে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ সমবেত হইয়া গীতবাদ্যে রত হইয়াছেন। তুমি শ্রোতাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট আছ। সেই অপূর্ব্ব তানলয় সম্বলিত সংগীতলহরী তোমার মনে এক অলৌকিক চমৎকারিত্ব রসের সৃষ্টি করিতেছে। সংগীত-তরঙ্গের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয়ের ভাবরাশিও যেন আন্দোলিত হইতেছে। তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন এক বিচিত্র সুধারসে আপ্লুত হইতেছে। এইমাত্র তুমি অনুভব করিতেছ, আর অধিক কিছু জান না। কিন্তু যে সংগীত বিদ্যাভিজ্ঞ গায়ক ও বাদকগণ এই অপূর্ব্ব রসের আবির্ভাব করিতেছেন তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানেন; তাঁহারা সেই স্বর-লহরীর প্রত্যেক কম্পনের নিয়ম ও প্রণালী অবগত আছেন; অতএব তাঁহারা সেই সংগীতের ভিতর পিঠ দেখিতেছেন।

এইরূপ সকল বিষয়েই। এইরূপ ধর্ম্মের ও একটা বহিঃপুর ও একটা অন্তঃপুর আছে। বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে দেখ ধর্ম্ম কতকগুলি অর্থশূন্য ক্রিয়ামাত্র। আমরা অনেক সময় নিকৃষ্ট প্রাণিদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমরা তাহাদের ভাষা বুঝি না বা মনের ভাবের বিষয় অভিজ্ঞ নহি। কেবল তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাহাদের মানসিক অভাব বা

আকাঙ্ক্ষার অনুমান করিয়া থাকি। যখন দেখি কোনও পক্ষী বাসা বাঁধিবার জন্য কুটী বহিতেছে, তখন বলি ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে। তাহার বাসা বাঁধাটা একটা স্বাভাবিক অভাবের জ্ঞাপক। সেইরূপ মনে কর তুমি কোনও অপরলোকবাসী উন্নত জীব, তুমি দূর হইতে মানবের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। তুমি দেখিতেছ কতকগুলি জাহাজ নদীতীরে আসিয়াছে, আর দলে দলে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় মানব-শ্রেণী নানা প্রকার দ্রব্য বহিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা পিপীলিকাদিগের খাদ্য বহন দেখিয়া যেমন বিচার করি, সেইরূপ তুমি বিচার করিতেছ, এগুলি ইহাদের খাদ্য অথবা অপর কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু হইবে, নতুবা যত্নপূর্ব্বক বহিয়া ঘরে লইয়া যাইবে কেন? এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তুমি কতগুলি দেবমন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা ও অপরাপর প্রকার ভজনালয় দর্শন করিলে। তুমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছ ইহারা এখানে কি করিতেছে? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে? এ ব্যাপারটা কি? এ সকল কার্য্য কোন্ স্বাভাবিক অভাবের জ্ঞাপক? বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে দেখিলে ধর্ম্মের এই সকল ক্রিয়ার ন্যায় অর্থশূন্য ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই সকল ক্রিয়ার অন্তরালে একটা অন্তঃপুর আছে, একটা সাজঘর আছে, যেখান হইতে এই সকল ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। সেই মূলীভূত আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া চিন্তাশীল ভাবুকগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা মানবকে অপরাপর জীব হইতে পৃথক করিতেছে। মানব অনন্ত-মুখীন জীব। এই অনন্ত-মুখীনতা মানবের প্রকৃতি-নিহিত। এই আকাঙ্ক্ষাই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা বিশ্বাস ও প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। তখন আত্মা সেই পরাৎপর পরম পুরুষে ক্রীড়া করিয়া থাকে ও তাঁহাতেই রমণ করে। এই প্রেমই ধর্ম্মের অন্তঃপুর আর ক্রিয়া ধর্ম্মের বহিঃপুর। ধর্ম্মের অন্তঃপুরে প্রেম, বহিঃপুরে ক্রিয়া, একথা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের আর বহিরঙ্গের প্রয়োজন নাই। বৃক্ষের বীজ যেমন কোষ ভিন্ন বাঁচে না, তেমনি ধর্ম্মের প্রাণ-ভূত বিশ্বাস ও প্রীতি ক্রিয়া ভিন্ন প্রায় বাঁচে না। এই জন্য ধর্ম্ম ভাবের পরিপোষণার্থ আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা সদনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা

প্রকার বাহ্য ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র বাহ্য ক্রিয়া থাকিলেই ধর্ম্ম হয় না। যেখানে অন্তরে প্রেম আছে, সেই খানেই বাহ্য-ক্রিয়া ধর্ম্মের পরিপোষক। অন্যত্র ক্রিয়া সকল বরং ধর্ম্মের উন্নতিকে রোধ করিয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এক দিকে আত্মক্রীড় ও আত্মরতি অপর দিকে ক্রিয়াবান অর্থাৎ সদনুষ্ঠান-সম্পন্ন হন ; কিন্তু যাঁহারা কেবল ক্রিয়ামাত্র-কেই অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা যেন নিরন্তর ধর্ম্মের বহিঃপুরেই বাস করিতেছেন।

এজগতে আমরা যত লোককে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত দেখিতেছি, তাহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মের বহিঃপুরে বাস করিতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহ্য-ক্রিয়া সকলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণের উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া কোলাহল ও বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। অন্তঃ-পুরের সুস্নিগ্ধ বায়ু ও নির্ম্মল আলোকে যথন প্রবেশ করিবে, তথন হয় ত ঐ বিবাদ বিসম্বাদ ও উত্তেজনা অনেক পরিমাণে প্রশান্ত হইবে। ধর্ম্মের অন্তঃ-পুরের এই সুস্নিগ্ধ বায়ু যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন ও ইহার নির্ম্মল আলোক যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মজীবনের গূঢ় সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা আর ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর শাস্ত্র বা গুরুমুখের উপরে নির্ভর করিতেছে না। শাস্ত্র ও গুরু তাঁহাদের অন্তঃস্থ ধর্ম্মের সাক্ষী ও সহায় মাত্র। তাঁহাদিগকে মরুভূমিতেই রাখ, আর সজন নগরেই রাখ, সর্ব্বত্র তাঁহারা ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। তাঁহারা জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদাই হরিদ্বর্ণ ও সর্ব্বদাই সুন্দর। আমরা যতদিন ধর্ম্মের এই স্থায়ী ভূমি প্রাপ্ত না হই, ততদিন কোনও ক্রমেই সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ঈশ্বরান্বেষণ।*

The youug lions *do* lack and suffer hunger; but they that seek the Lord *shall* not want any good thing.—Ps. XXXIV—Verse 10.

অর্থ—যৌবন-প্রাপ্ত সিংহেরও অভাব হয়, সেও ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে নিশ্চয় তাহাদের কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভাব হইবে না।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে দায়ুদের সঙ্গীতাবলী নামে যে গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত বচন উদ্ধৃত হইল।

সর্ব্বাগ্রে সকলকে shall শব্দটীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। এই শব্দটী কিরূপ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক! দায়ুদ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে, তাহাদের কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভাব হইবে না। এই সুদৃঢ় প্রতীতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? তিনি নিশ্চয় নিজ জীবনে অথবা অপরাপর বিশ্বাসিগণের জীবনে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, নতুবা এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

সে যাহা হউক এখন আমরা আলোচনা করি—যৌবন-প্রাপ্ত সিংহেরও অভাব হয়—একথা বলিবার অভিপ্রায় কি? যৌবন-প্রাপ্ত সিংহ এই পদাবলী আমাদের অন্তরে কি ভাব আনিয়া দিতেছে? সিংহ যত দিন শিশু থাকে, তত দিন তাহার মাতার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে। সে মাতার সঙ্গে বিচরণ করে; মাতার কাছে কাছে থাকে; মাতা অপর প্রাণীকে হত্যা করিয়া দিলে তবে আহার করিতে পায়। কিন্তু সে যৌবন-প্রাপ্ত হইলেই

* ১৮৯৬ সাল, ৫ই, জুলাই রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এ সমুদায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন সে আর মাতার উপরে নির্ভর করে না; তখন নিজ বলের পরিচয় পাইয়া তাহার মন যৌবন-মদে উন্মত্ত প্রায় হয়; তখন তাহার গর্জ্জনে অরণ্যবাসী প্রণী সকল কাঁপিতে থাকে; তখন সে নিজে অপর প্রাণিদিগকে হত্যা করিতে আনন্দ পায়; এবং বলদর্পে স্ফীত হইয়া অপর প্রাণিদিগের উপর লম্ফ দিয়া পড়ে, এবং দন্ত ও নখের আঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহ বলিলে এই বল-জনিত দর্পের ভাবই আমাদের অন্তরে আসে।

এ জগতে মানুষও অনেক সময়ে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় নিজ বল-দর্পে দর্পিত হইয়া থাকে। ধন বল, জন বল, জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল প্রভৃতি অনেক প্রকার বল আছে। এই সকল প্রকার বলের দর্পেই মানুষকে স্ফীত দেখিতে পাওয়া যায়। ধনিদিগের ধনের দর্প, রাজাদিগের রাজ-শক্তির দর্প, সকলেরই সুপরিচিত, বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতেছি সভ্যতাভিমানী পরাক্রমশালী জাতি সকল যেখানেই কৃষ্ণবর্ণ দুর্ব্বল জাতিদিগের সংস্রবে আসিতেছেন, সেখানেই তাহাদিগকে পশুযূথের ন্যায় হত্যা করিতেছেন। ইহা আপনাদের পরাক্রম ও শক্তির জ্ঞান জনিত দর্পেরই কাজ। জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও পরের প্রতি উৎপীড়ন আছে তাহার মূলে বল-জ্ঞান-জনিত দর্প বিদ্যমান।

এই বল-জ্ঞান-জনিত দম্ভ যে কেবল ধনবান বা পরাক্রমশালী ব্যক্তি-দিগেরই হয়, তাহা নহে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম জনিত দম্ভও আছে। একজন কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোচনা করিয়াছেন, হয় ত দর্শন শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া-ছেন, তিনি অপরের সহিত আপনার তুলনা করিয়া দেখিতেছেন যে, পাদপ-হীন দেশে যেমন এরণ্ড বৃক্ষের মস্তক উন্নত দেখায়, তেমনি অজ্ঞ সমাজের মধ্যে তাঁহার মস্তক উন্নত দেখাইতেছে, অতএব তিনি এই ভাবিয়া মনে মনে দম্ভ করিতেছেন যে, আমার ন্যায় জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক আর নাই। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় এই সকল ব্যক্তি প্রধানতঃ আপনাদেরই উপরে নির্ভর করিয়া থাকেন; সুতরাং প্রকৃত উৎকৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন লাভে ইঁহারা বঞ্চিত হন।

এই দম্ভের ন্যায় ধর্ম্মজীবনের শত্রু আর নাই। এই কারণেই ভক্তি-পথাবলম্বিগণ দীনতাকে ভক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ করিয়াছেন। তোমার সমক্ষে যদি একটি দশ হস্ত উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপ থাকে, তাহাতে যেমন হিমালয়কেও তোমার দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে, তেমনি একটু দম্ভ তোমার দৃষ্টি হইতে অপরের পর্ব্বত প্রমাণ সাধুতাকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। তুমি উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে যে দিকে চাহিতে যাও সেই দিকেই একটা স্তূপ তোমার দৃষ্টিকে রোধ করে,সেটা তোমার নিজের মস্তক, তবে আর তুমি সাধু জনের সাধুতা বা কি দেখিবে এবং ঈশ্বরের মহত্বই বা কি বুঝিবে! যে রূপবতী নারীর নিজের রূপের জ্ঞান আছে এবং প্রতি পদ-বিক্ষেপে সেই রূপের জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাঁহাকে যেমন কদর্য্য দেখায়, তেমনি যাঁহার মনে জ্ঞান-জনিত বা ধর্ম্ম-জনিত দম্ভ আছে, তাঁহাকেও কদর্য্য দেখায়। তবে দেখিতেছি ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আত্মপরীক্ষা দ্বারা সর্ব্ববিধ দম্ভ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। তৎপরে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরা-ন্বেষণ কাহাকে বলে? এবং ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কি প্রকার মন লইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়? তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বচনে বলা হইয়াছে—"যাহারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে" এরূপ বলা হয় নাই—"যাহারা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করে।" যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে ও যাহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, এ উভয়ে যে অনেক প্রভেদ তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। কেবলমাত্র নির্ভর বলিলে সকল কথা বলা হয় না। কারণ নিতান্ত স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যক্তিও ইষ্ট-দেবতার প্রতি নির্ভর করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালী পূজা করে; কারণ তাহারা আশা করে যে, কালীর সাহায্যে স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইবে; কালীর সাহায্যের প্রতি তাহাদের নির্ভর থাকে। এই নির্ভরের মূলে কি ভাব? তাহারা তদ্দ্বারা কি কালীকে অন্বেষণ করে? অথবা আপনাদিগকেই অন্বেষণ করে? সকলেই বলিবেন—তাহারা আপনাদিগকেই প্রধানতঃ

অন্বেষণ করে ; স্বার্থ সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য, কালী তাহার সহায় ও উপায় মাত্র। তেমনি মানুষ অনেক স্থলে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাহার মূলে এই ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে—হে ঈশ্বর আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক,তোমার দ্বারা। ইহা ত ঈশ্বরান্বেষণ নহে, ইহা নিজেরই অন্বেষণ। প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী ব্যক্তির প্রার্থনা এই—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার দ্বারা।" ঈশ্বরান্বেষণের মূলে আত্মবিস্মৃতি ; যেখানে আত্মবিস্মৃতি নাই, সেখানে ঈশ্বরান্বেষণও নাই।

এই আত্ম-বিস্মৃতি হইতেই অকৃত্রিম বৈরাগ্যের উদয় হয়। একটী বালকের একটী পায়রা উড়িয়া যাইতেছে, সে সেই পায়রাটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিমগ্নচিত্তে দৌড়িতেছে, ও দিকে তাহার স্কন্ধের চাদর কাদায় লুটাইতেছে, সে তাহা জানিতেও পারিতেছে না, পথের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ওরে তোর চাদর গেল!" তেমনি যে সাধু একাগ্রচিত্তে, ঈশ্বরান্বেষণ করেন, তাঁহার স্বার্থের বসন খসিয়া যায়, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না, জগতের লোক হয় ত বলাবলি করে, "দেখ দেখ লোকটার স্বার্থ একেবারে খসিয়া গেল?" ইহাকেই বলে আত্ম-বিস্মৃতি-জনিত প্রকৃত বৈরাগ্য।

অতএব প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণের প্রথম ও মূলগত ভাব আত্ম-বিস্মৃতি। যেখানে আত্ম বিস্মৃতি সেই খানেই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা! যিনি প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তাঁহার ঈশ্বরান্বেষণ ভিন্ন অন্য অভিসন্ধি নাই। যে মনে অভিসন্ধি নাই, তাহাই নির্ম্মল মন। এরূপ নির্ম্মল মনেই ঈশ্বরের মুখজ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সাধুগণের একবাক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ বলেন—"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই নিষ্কল পুরুষকে দেখিতে পান। বাইবেল গ্রন্থে আছে—"Blessed are the pure in heart for they shall see God" অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহারাই ধন্য ; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন। ইহা একই উপদেশ। নির্ম্মল মন না হইলে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ

করা যায় না। কিন্তু নির্ম্মল মন লাভ করার ন্যায় কঠিন সাধনাও আর নাই। আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে দিবানিশি সজাগ থাকিয়াও অনেক সময়ে আপনাদের হৃদয়কে ক্ষুদ্র অভিসন্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারি না। এমন কি ক্ষুদ্র অভিসন্ধি অনেক সময়ে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসে। তখন আমাদের আর উপায় থাকে না। আপনাদের এই দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে একটী প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কথা স্মরণ হয়। সে কাহিনী এই, ক্রূরমতি মহীরাবণ রাত্রিযোগে রাম লক্ষ্মণকে হরণ করিবার চেষ্টাতে আছে। বিভীষণ হনূমানকে দ্বারে রাখিয়া বলিয়া গেলেন স্বয়ং কৌশল্যা আসিলেও দ্বার ছাড়িবে না। হনূ তথাস্তু বলিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহীরাবণ নানারূপ ধারণ করিয়া আসিতে লাগিল। কখনও ভরত হইয়া, কখনও জনক হইয়া, কখনও কৌশল্যা সাজিয়া আসিল, হনূ কিছুতেই দ্বার ছাড়িলেন না। অবশেষে মহীরাবণ বিভীষণের আকার ধারণ করিয়া আসিল। তখন হনূর সতর্কতাতে আর কুলাইল না। যে বিভীষণ তাঁহাকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শত্রু যখন তাঁহার আকারে আসিল, তখন হনূ পরাস্ত হইয়া গেলেন, তেমনি যে ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে দ্বাররক্ষাতে নিযুক্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র অভিসন্ধি যখন সেই ধর্ম্মবুদ্ধির আকার ধারণ করিয়া আসে তখন আমরা আর আত্মরক্ষা করিতে পারি না। এই জন্যই বলিয়াছি সকল প্রকার ক্ষুদ্র অভিসন্ধি হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার ন্যায় কঠিন সাধন আর নাই। অথচ ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা না হইলে প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণই হয় না।

তৃতীয়তঃ যে সাধু প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তিনি ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইবার জন্য প্রস্তুত। তুমি যদি ঈশ্বরকে এ কথা বলিতে না পার—তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিব, যাহা ছাড়া প্রয়োজন তাহা ছাড়িব, তবে তুমি কিরূপ ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছ? ইহাকে যদি তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ মনে না কর, তবে কি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইহার অন্বেষণ করিতে পার? আমার পাইলেও হয়, না পাইলেও ক্ষতি নাই, এরূপ মনের ভাব লইয়া কি কেহ নিমগ্ন চিত্তে কোনও বিষয়ের অন্বেষণ করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরকে

লাভ করিতে গিয়া যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্—এরূপ চিত্ত ভিন্ন তাঁহার অন্বেষণ হয় না। এরূপ ভাবের মূলে আনুগত্য—অর্থাৎ আমি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইতে প্রস্তুত এই ভাব। এটীও ঈশ্বরান্বেষণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই ভাব হইতেই ধর্ম্মজীবের বীরত্বের উদয় হয়। এরূপ ব্যক্তি অকুতোভয়ে সত্যের অনুসরণ করেন, এবং ক্ষতিলাভের চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন।

পূর্ব্বোক্ত বচনের সর্ব্বশেষ উক্তি—ঈশ্বরান্বেষীর কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভাব হইবে না। ইহা আমরা দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট বিষয় আর নাই, অতএব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ যে কোনও বিষয়ের প্রয়োজন তাহারও অভাব হইবে না। তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যদি তোমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, অর্থ পাইবে, মানুষের প্রয়োজন হয়, মানুষ পাইবে সে জন্য ভাবিও না, কেবল এই দেখ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতেছ কি না? সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ ধন জনেরও অভাব হইবে না, তাহা হয় ত অনেকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অথচ জগতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ ইহার উজ্জল প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যেখানেই মানব নিঃস্বার্থ ও অকপট ভাবে ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছে, অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কার্য্যে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছে, সেই খানেই ধন জনের অপ্রতুল থাকিতেছে না। অপর দিকে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের নিজের অভাব নিবারণের কারণ ও আয়োজন সত্বেও সে যেমন কখন কখনও ক্ষুধায় মরে তেমনি ধনে জনে বলবান ব্যক্তিরাও হয় ত কৃতকার্য্যতা লাভে অসমর্থ হইতেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ও বিনয়ী সাধু ঈশ্বরের প্রচুর কৃপা লাভ করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

ধর্ম্মজীবনের উপাদান। *

আমরা ধর্ম্মজগতে তিন প্রকার বিভিন্ন ভাবাপন্ন তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শ্রেণীর সাধকগণ মতের বিশুদ্ধতাকেই ধর্ম্মজীবনের সর্ব্ব প্রধান উপাদান বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ মতকে সত্য মত ও ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি কেহ সেই মতগুলিকে অবলম্বন না করে, তবে তাঁহারা সেরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম্মজীবন হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই বিদ্বেষ-বুদ্ধির মূলে প্রবেশ করিলে আর একটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের এই বিশ্বাস আছে যে, বিকৃতহৃদয় না হইলে কেহ সত্যকে বিকৃত ভাবে দর্শন করে না। আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি তাহাই সত্য, সুতরাং যাহারা তাহাকে বিকৃত ভাবে দর্শন করিতেছে তাহাদের হৃদয় নিশ্চয় বিকৃত। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ সামান্য মত ভেদের জন্য বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে দস্যু তস্করের ন্যায় শাস্তি দিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বদেশে বিদেশে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের সহিত বিবাদ, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও পরস্পরকে নিগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি বঙ্গবাসিদিগের সুবিদিত; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে এরূপ বিরোধ ঘটনা হইয়াছে যে, দ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণদিগের জল গ্রহণ করেন না; অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবাদীদিগের জল গ্রহণ করেন না। এক জাতীয় লোক হইয়াও তাঁহারা পরস্পরকে বিভিন্ন জাতীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ত গেল বর্ত্তমান সময়ে;

* ১৮৯৬ সাল, ১৯শে, জুলাই রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এ দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তেও এই মত-বিভেদ-জনিত বিদ্বেষের প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশে এক কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধকদিগের মধ্যে যে বিবাদ ঘটনা ঘইয়াছিল, তাহার সমুদায় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু এই মত-বিরোধ-নিবন্ধন যে পরস্পরকে অনেক নিগ্রহ করা হইত, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে এতদ্দেশেই এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে; অপরাপর দেশেও এই ভাবাপন্ন লোকদিগের কার্য্যের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কথাতে প্রয়োজন কি, প্রাচীন গ্রীকগণ যে খ্যাতনামা সক্রেটিসকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? তিনি কোন্ অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন? কোন্ গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন? তিনি কি দস্যু বা তস্করের ন্যায় পরপ্রাণহরণ করিয়াছিলেন? অথবা দুষ্ক্রিয়ান্বিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিহীন লোকের ন্যায় ধর্ম্ম-শৃঙ্খলকে ভগ্ন করিয়াছিলেন? তবে কোন্ অপরাধে তাঁহার প্রতি এই গুরুতর দণ্ডের বিধান হইল? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা শত শত যুবকের মনে ঈশ্বর-পরায়ণতা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তিনি কোন্ অপরাধে নরহন্তা দস্যুর ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন? ইহার উত্তর এই—সক্রেটিস এমন কোনও কোনও মত প্রচার করিয়াছিলেন যাহা প্রচলিত মতের বিরোধী। সুতরাং প্রাচীন মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ তাঁহাকে চোরের অধম বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে যদি আমরা মহাত্মা যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? তিনি কোন্ অপরাধে চোরের শাস্তি পাইলেন? তিনি কি দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক ছিলেন? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জগতের কোটি কোটি নরনারী ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে তিনি কি এক জন দস্যুর শাস্তি ভোগ করিবার উপযুক্ত? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাইলেট যখন য়িহুদীদিগকে বলিলেন,—"বিশেষ উৎসবের দিনে একজন কয়েদীকে নিষ্কৃতি দিতে চাই,—তোমরা কি বল? এই যীশুকে কি নিষ্কৃতি দিব?" তখন য়িহুদীগণ বলিল,—"না বরং বারাবাস নামক চোরকে নিষ্কৃতি দিন, কিন্তু যীশুকে হত্যা করুন।" একজন দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক নিষ্কৃতি পাইয়া তাহাদের সমাজে প্রবেশ করে, ইহা তাহাদের পক্ষে শ্রেয় বোধ হইল; কিন্তু যীশুর প্রাণ রক্ষা

শ্রেয় বোধ হইল না। তিনি চোরেরও অধম বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহার কারণ কি ?, কারণ মতের বিশুদ্ধতার প্রতি য়িহুদীদিগের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাহারা মতের বিশুদ্ধতার দ্বারাই মানুষের বিচার করিত। সর্ব্বত্রই মতের বিশুদ্ধতাবাদীদিগের অল্লাধিক পরিমাণে এই ভাব।

এই মতের বিশুদ্ধতাবাদীগণ যেমন এক দিকে মতের বিশুদ্ধতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্মজীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের যদি মতের বিশুদ্ধতা থাকে কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অপরাপর লক্ষণ কিছুই না থাকে, তথাপি তাঁহারা সে ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মনে কর একজন ব্রাহ্ম আছেন, যিনি দিনের পর দিন ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করেন না ; ভুলিয়াও একদিন সাপ্তাহিক উপাসনা মন্দিরে আসেন না ; সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে হয় ত গৃহে বসিয়া বন্ধুদিগের সহিত তাস খেলিয়া কাটান ; তাঁহার গৃহে কোনও প্রকার গার্হস্থ্য বা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখা যায় না ; কিন্তু তাঁহার মতগুলি অতি বিশুদ্ধ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। মতের বিশুদ্ধতা দ্বারা প্রধানতঃ যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করেন, তাঁহাদের নিকট ইনি একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার মতের বিশুদ্ধতার দ্বারা যেন সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে !

এইরূপ ধর্ম্ম জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ভাবুকতাকেই ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। উৎসাহের সহিত দশজনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলে, অথবা প্রাণায়াম সহকারে একাগ্রতার সহিত মন্ত্রবিশেষ জপ করিলে যে ভাবোদয়-জনিত একপ্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্ত সুখের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকেই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সুতরাং তদ্দ্বারাই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃস্ফূর্ত্ত সুখ লইয়াই তাঁহারা চরিতার্থ ; অপর সকল বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন। মানুষের মত অথবা নীতি বিশুদ্ধ হউক বা না হউক সে দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। একজন সাকারবাদীই হউক অথবা নিরাকারবাদীই হউক, বাক্যে ও ব্যবহারে সত্যনিষ্ঠই হউক বা কপটচারীই হউক, তাহাতে আসে যায় না ; এই বিশেষ ভাবের সাধনে যিনি যত

অগ্রসর তিনি এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে তত অধিক সাধক নামের উপযুক্ত।

তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়ার আচরণ ও বাহিরের বিধি ব্যবস্থা পালনকেই ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধন ইঁহাদের চক্ষে কতকগুলি বাহিরের নিয়ম পালন মাত্র; এবং যিনি যে পরিমাণে সেই সকল নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, তিনিই ইঁহাদের চক্ষে সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এই বাহ্য নিয়ম পালনের তুলনায় ধর্ম্মজীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের মত বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ হউক, তাহার হৃদয়ে প্রেম থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে আসে যায় না, সে যদি শাস্ত্রোক্ত বা কুলক্রমাগত নিয়ম সকল মানিয়া চলে, তবেই এই শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট। আমরা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবস্থা দেখিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্বয় অগ্রে যাহাই থাকুক এক্ষণে কেবল বাহ্য নিয়ম পালনে দাঁড়াইয়াছে। তোমার মত ওভাব যেরূপই হউক না কেন, তুমি বাহিরের নিয়মগুলি পালন করিলেই তাহাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

অগ্রে ধর্ম্মজীবনের যে তিন প্রকার উপাদানের উল্লেখ করা গেল, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার কোনওটীকেই অবহেলা করেন না। এই তিনটীই ধর্ম্মজীবনের উপাদান, এবং ধর্ম্মজীবন গঠনে তিনটীরই প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিনটীকে প্রধান উপাদান বলিয়াও সন্তুষ্ট নহেন; আরও কতকগুলি উপাদান আছে, যাহা প্রধান না হইলেও এগুলির পরিপোষকও সহায়। সেগুলির অভাবে এগুলি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণরূপ কার্য্যকারী হয় না। সেগুলিকে নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীরের পাদরক্ষক ভিত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই পাদরক্ষক ভিত্তিকে এতদ্দেশে পোস্তগাঁথা বলে। ইহা অনেকেরই বিদিত আছে, যে নদীতীরে প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অনেক দূর হইতে পোস্ত গাঁথিয়া তুলিতে হয়। ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। পোস্ত যেমন প্রাচীর নহে, কিন্তু প্রাচীরের দৃঢ়তাবিধান ও রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি এই উপাদানগুলি মুখ্য না হইলেও ধর্ম্মজীবনের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক। সেগুলিকে

আর একপ্রকার পদার্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, যাহারা কোনও পদার্থে কোনও প্রকার রং ধরাইতে চায়, তাহারা সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার রংএর অস্তর দিয়া থাকে। অস্তর না দিলে তাহাতে রং ভাল করিয়া ফলে না, অর্থাৎ সুন্দর দেখায় না। আমি ধর্ম্মজীবনের যে উপাদানগুলির উল্লেখ করিব তাহারা যেন ধর্ম্মসাধনের অস্তরস্বরূপ। সেগুলি না থাকিলে ধর্ম্মসাধনের ফল সমুচিতরূপ ফলে না।

সেই গৌণ উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম জ্ঞানালোচনা। জ্ঞানালোচনার অভ্যাস ও সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে না। জ্ঞানালোচনা বলিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা বুঝিতে হইবে না। সামান্য লৌকিক জ্ঞানের আলোচনাও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া থাকে। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, অঙ্ক, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি কোনও জ্ঞানই ফেলিবার জিনিস নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনে সকলেরই উপযোগিতা আছে। যাহাতে চিন্তাশীলতাকে বর্দ্ধিত করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগরুক করে, চিন্তার উপকরণ সামগ্রী সকলকে মনের মধ্যে সংগৃহীত করে, চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করে, মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত ও হৃদয়কে উদার করে, সে সমুদায় কি ধর্ম্মজীবন গঠনের উপযোগী নহে? অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে জ্ঞানালোচনা কখনই উপেক্ষণীয় বস্তু নহে। ব্রাহ্মপরিবার সকলের এ বিষয়ে মনোযোগ থাকা অতীব আবশ্যক। এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মমাত্রেই জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। এখন অনেক ব্রাহ্মপরিবারের অবস্থা এরূপ দেখা যায় যে তাঁহাদের সমগ্র ভবন অনুসন্ধান করিলে দশখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ মিলা দুষ্কর। অনেকের পাঠাগার প্রাচীরে সংলগ্ন একটী শেলফে পর্য্যবসিত; তাহাও ব্যবহারের অভাবে কীটাকুলিত। এরূপ অবস্থা অতীব শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ইহাকে ধর্ম্ম জীবনের একটী প্রধান উপাদান বলাই কর্ত্তব্য। অথচ ইহা ছোট বড় সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আমাদের সকলকেই সংসারে বাস করিতে হয়, গৃহধর্ম্ম করিতে হয়, সকলেরই কিছু

না কিছু কাজ আছে। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যাহার কোনও কর্ত্তব্য নাই ? যদি আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যকে অতি পবিত্র জ্ঞানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করি,তদ্দ্বারা আমাদের চরিত্রের এরূপ শিক্ষা হয় ও ধর্ম্মবুদ্ধির এরূপ বিকাশ হয়, যে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। আমরা কখন কখনও এক প্রকার ধর্ম্মসাধন দেখিতে পাই, যাহা আমাদের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আমরা এক প্রকার ভাবুক লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা ধর্ম্মের কথা বলিতে ও শুনিতে ভাল বাসেন ; সেইরূপ আলাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাপন করিতে প্রস্তুত ; উপাসনাদিতে বেশ অনুরাগ, ভাবের উচ্ছ্বাস ও বেশ আছে ; ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে তাঁহারা ভাল বাসেন ; কিন্তু কর্ত্তব্য-সাধনে মনোযোগ নাই। তাঁহাদের প্রতি কোনও কার্য্যের ভার দিয়া নির্ভর করিতে পারা যায় না, যে তাহা যথাসময়েও সমুচিত রূপে সম্পাদিত হইবে। একটু সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া বিষয়ান্তরে প্রস্থান করেন। মনে কর ব্রাহ্মসমাজের খাতা পত্র রাখিবার ভার একজনের প্রতি আছে, যেই অদূরে খোলের শব্দ উঠিয়াছে, বা একজন কথা কহিবার লোক জুটিয়াছে, অমনি খাতা পত্র পড়িয়া রহিল, তিনি সেখানে গিয়া জুটিলেন। স্পষ্ট বলিতে কি আমি এরূপ চরিত্রের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করি না। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ব্রাহ্মের ধর্ম্ম-জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ।

তৃতীয় উপাদান নরহিতৈষণা। আমাদের সমুদায় প্রীতি ও সমুদায় সেবা অল্প সংখ্যক সমবিশ্বাসী ও সমভাবাপন্ন লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। আমাদের প্রেমকে সমগ্র জগতে বিতরণ করিতে হইবে, ও আমাদের সেবাকে সমগ্র জগতের পরিচর্য্যাতে নিয়োগ করিতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ উদারভাব ভাষাতে ব্যক্ত করিতে ভাল এবং শুনিতেও ভাল, কিন্তু কার্য্যে করা দুষ্কর। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার হৃদয় কিরূপ বিশাল ও প্রীতি কিরূপ উদার ছিল

তাহা সকলে একবার চিন্তা করুন। স্পেনদেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী স্থাপিত হইলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় টাউনহল-গৃহে ইউরোপীয়দিগকে ভোজ দিয়াছিলেন। ইটালীদেশবাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, তিনি এক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ কিরূপ হৃদয়ের বিশালতা ও কিরূপ প্রেম! তাঁহার সমগ্র চেষ্টা নরহিতৈষণার দ্বারা অণুপ্রাণিত ছিল। বল দেখি রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে ভাল ব্রাহ্ম ছিলেন কি আমাদের ন্যায় সংকীর্ণ ও অনুদারচেতা লোক ভাল ব্রাহ্ম? তাই বলি যখন জ্ঞানালোচনা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নরহিতৈষণা এই তিনটী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মজীবনের ত্রিবিধ উপাদানের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনি পুষ্কল ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া থাকে।

জীবনের উচ্চ আদর্শ। *

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহং॥

ভগবদ্গীতা।

অর্থ—কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে প্রকার কর্ম্মের আচরণ করে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোক-সংগ্রহ করিবার মানসে, সেইরূপ আচরণ করিবেন।

ভগবদ্গীতাতে পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতাগ্রন্থ যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, যে গীতাতে সর্ব্বত্রই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; এক শ্রেণী অজ্ঞ ও কর্ম্মে আসক্ত, অপর শ্রেণী জ্ঞানী ও কর্ম্মে অনাসক্ত। গীতার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই, জ্ঞানিগণও অজ্ঞদিগের ন্যায় কর্ম্মের আচরণ করিবেন; প্রভেদ এই মাত্র থাকিবে যে, জ্ঞানিগণ কর্ম্মের আচরণ করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিবেন।

আমরা জানি গীতার এই উপদেশ অনেকের মনঃপূত নহে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে, গীতা জ্ঞানিগণকে কপটাচরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন; যাহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, যাহাকে তাঁহারা অজ্ঞ-জনোচিত মনে করেন, যাহার আচরণে তাঁহাদিগকে অসত্যের বা অন্যায়ের আচরণ করিতে হয়, গীতা জ্ঞানীদিগকে কেবল মাত্র লোক-সংগ্রহের মানসে এমন কর্ম্মেরও আচরণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় গীতার অভিপ্রায় তাহা নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই গীতার সৃষ্টি। এতদ্দেশে এক শ্রেণীর জ্ঞানী দেখা দিয়া-

* ১৮৯৬ সাল, ২৬শে, জুলাই রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

ছিলেন, যাঁহারা সন্ন্যাসকে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগকে ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। এখনও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণ এদেশে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা কর্ম্মের ও আশ্রম-ধর্ম্মের সমুদায় চিহ্ন ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ যে অসত্য, অন্যায়, বা অধর্ম্ম বোধে কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন এই বোধেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গীতা এই শ্রেণীর সাধককে বলিতেছেন ;—কর্ম্ম তোমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শনের জন্য ইহার আচরণ কর। এই ভাব যে ধর্ম্মজগতে সম্পূর্ণ নূতন, অথবা গীতাতেই কেবল ইহা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে ; অন্যান্য অনেক স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশীয় বৈষ্ণবগণের একটী বচন প্রচলিত আছে,—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" মহাত্মা চৈতন্যের সম্বন্ধে তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। চৈতন্যকে তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে স্বয়ং ভগবানের পক্ষে ধর্ম্মসাধনের বাহিরের নিয়ম সকল পালন করা প্রয়োজনীয় না হইলেও লোক-শিক্ষার জন্য তিনি ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়গণও এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং ভগবান জগতকে পুত্রত্বের ও বাধ্যতার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য পুত্ররূপী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহই তাঁহার অবতারত্ব স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য। লোক-সংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মের আচরণ, এই ভাব অপরাপর স্থলে এবং অপরাপর ভাবেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডে এরূপ অনেক ভদ্রলোক আছেন যাঁহারা লোক-সংগ্রহের উদ্দেশেই, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই, সম্পূর্ণরূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনও দিন পরিমিত পরিমাণে একটু সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। অথচ এইজন্য সম্পূর্ণরূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটু পান করিবার রীতি রাখিলে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সুরাপায়ী হইয়া অতিরিক্ত মাত্রাতে গমন করে। এ যুক্তি যে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর তাহাও বলিতে পারা যায় না।

সে যাহা হউক, আমরা গীতার পূর্ব্বোক্ত রচনটী হইতে আর এক প্রকার উপদেশ লাভ করিতে পারি। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতেছি—অজ্ঞ এবং জ্ঞানী। এই উভয় শ্রেণীর ভাব পরস্পর হইতে বিভিন্ন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন যে কর্ম্মের আচরণ করে, তখন সেই কর্ম্মের অতিরিক্ত আর কিছু জানে না; তাহাদের দৃষ্টি সেই কর্ম্মরূপ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে যায় না; তাহারা সেই কর্ম্মকেই পরমার্থ মনে করে; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত থাকে। জ্ঞানিগণের ভাব অন্ত প্রকার; তাঁহাদের দৃষ্টি কর্ম্মের বাহিরে জ্ঞানরাজ্যে অনেক দূর প্রসারিত; তাঁহারা কর্ম্মের আচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মকে সামান্ত বলিয়াই জানেন; তাঁহারা কর্ম্মকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন না; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মে বাস করিয়াও কর্ম্মের অতীত সুদূর প্রসারিত জ্ঞানরাজ্যে বাস করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মের আচরণে অনেক প্রভেদ আছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উভয় প্রকার ভাবের প্রভেদ কিয়ৎ পরিমানে বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর কোনও গৃহস্থের কুলবধূ কোনও পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতাতে স্বীয় পতির নিকটে থাকিবার জন্ত আসিতেছেন। এক দিন রজনীযোগে তাঁহাকে সহরের বাড়ীতে আনা হইল; তিনি নৈশ অন্ধকারে সহরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এমন কি যে ভবনে আসিলেন, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না; পর দিন প্রাতে উঠিয়া নিজ বাস ভবনটী দেখিয়া বলিলেন—"ও বাবা! এ যে দেখি প্রকাণ্ড পাকা কোঠা বাড়ী, এ যে দেখি গ্রামের অমুক বাবুর বাড়ীর মত?" তিনি গ্রামে পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন এবং জন্মের মধ্যে গ্রামের একঘর ধনীর ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন ভিন্ন আর ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন দেখেন নাই; সুতরাং সহরের স্বীয় বাস ভবনটী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, সেই ভবনটী সহরের একটী প্রধান ভবন ও সেই পাড়াটী সহরের একটী প্রধান স্থান। তিনি যে ভবনটীতে বাস করিতেছেন তাহা হইতে বাহিরের কিছু দেখিবার যো নাই, সুতরাং তাঁহার এই ভ্রান্তিও ঘুচিবার উপায় নাই। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক দিন তাঁহার পতি বলিলেন,—"চল তোমাকে সহর

দেখাইয়া আনি।” এই বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সহর দেখাইয়া আনিলেন। বধূটী সহর দেখিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিয়া বলিলেন,—“মাগো সহর এত বড়! ওমা সহরের কি ওঁচা জায়গাতে আছি, ও কি ছোট বাড়ী-তেই আছি!” জিজ্ঞাসা করি, এই রমণীর পূর্ব্বভাব ও বর্ত্তমানভাবে প্রভেদ কি হইল? তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে বাস করিতেছিলেন এখনও সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে যে গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে-ছিলেন. এখনও তাহাই করিতে লাগিলেন, তবে প্রভেদ কোথায় রহিল? প্রভেদ রহিল জ্ঞানে; পূর্ব্বে জানিতেন তাঁহাদের ভবনটী সহরের মধ্যে একটী প্রধান ভবন, এখন জানিলেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র। পূর্ব্বে স্বীয় ভবনটীকে মহৎ জানিয়া হৃদয়ে একটু অহঙ্কার ছিল, এখন তাহাকে ক্ষুদ্র জানিয়া হৃদয়ে একটু বিনয় আসিল:—এইমাত্র প্রভেদ। গীতোক্ত অজ্ঞ ও জ্ঞানীর মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ প্রভেদ। উভয়ে একই কর্ম্মের মধ্যে বাস করিতে পারেন, অথচ উভয়ের ভাব বিভিন্ন।

ভগবদ্গীতা কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সাধারণ মানব-জীবন সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারি। আমরা মানবকে বলিতে পারি,—“হে মানব! তুমি এই জীবনের মধ্যে বাস কর, কিন্তু চিত্তকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখিও না; জীবনের মহৎ ও উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীবনের দৈনিক সীমাকে ক্ষুদ্র জানিয়া, ইহার মধ্যে বাস কর। এই জীবনটার আদর্শ আমাদের যাঁহার মনে যে প্রকার তিনি সেই ভাবেই এ জীবনে বাস করিয়া থাকেন। অনেক মানবের মনে আহার, নিদ্রা বংশরক্ষা, সন্তান-পালন, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থসঞ্চয় ইহার অতিরিক্ত জীবনের উচ্চতর আদর্শ নাই। ব্রাহ্মের পক্ষেও কি তাহাই? ব্রাহ্ম! তোমার মনে জীবনের যে ভাব আছে তাহা কি ইহাতেই পর্য্যবসিত? তুমি যদি খাইয়া ও ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া যাও, তাহা হইলেই কি মনে করিবে যে তোমার জীবনের সার্থকতা হইয়াছে”?

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে এক মহৎ ও উচ্চ আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আমরা এই জগতের জীবনকে আমাদের জীবনের শৈশবাবস্থা

মনে করি। এ জগৎ আমাদের কর্ম্মফল ভোগের জন্ম কারাগার নয়, আন্দামান দ্বীপ নয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি; আমাদের করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা আমাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিবার জন্ম এখানে রাখিয়াছেন। তিনি এই জগতকে ও মানবজীবনকে আমাদের শিক্ষা ও উন্নতির উপযোগী এবং আমাদিগকে জগতের উপযোগী করিয়াছেন। এ জগতে থাকিয়া আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও ধর্ম্মে উন্নত হইব. এবং এ জগত হইতে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া যখন শেষ হইবে, তখন অপর জগতে আহূত হইব ;—ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। এ সম্বন্ধে জন্মের সহিত মৃত্যুর যেন সাদৃশ্য দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আমরা কি দেখি? দেখিতে পাই, মাতৃগর্ভের যাহা দিবার ছিল, তাহা যখন দেওয়া হইল, তখন যেন মাতৃগর্ভ শিশুকে বলিল,—"হে ভ্রূণ-দেহ! আমার যাহা দিবার ছিল দিয়াছি, এখন তুমি আলোকময় রাজ্যের উপযুক্ত হইয়াছ অতএব সেখানে গমন কর।" ইহারই নাম জন্ম। ঈশ্বর-ভক্ত সাধুর মৃত্যু সময়েও যেন তাহাই ঘটে। এ জগত যেন বলে—"হে সাধো! আমার যে কিছু শিক্ষা দিবার ছিল, তাহা তোমাকে দিয়াছি, এখন তুমি অপর জগতের জন্ম প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব সেখানে গমন কর।"

এখানে বাস করিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই যদি মানব-জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে খাইয়া ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া গেলেই তাহা সংসিদ্ধ হয় না। এ জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। জ্ঞানালোচনা দ্বারা মনকে উন্নত করা, প্রীতির দ্বারা হৃদয়কে প্রসারিত করা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে সবল করা, ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ভক্তিকে উজ্জ্বল করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহার অকরণে আমরা প্রত্যবায়ভাগী।

জীবনের এই মহৎ ভাব যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ না করি, তাহা হইলে অনিবার্য্য রূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। মানবাত্মার প্রকৃতি যেন মৎস্যের প্রকৃতির ন্যায়। মৎস্যকে যত প্রসারিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দিবে, ততই

তাহার আকৃতি, বল ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে ; আর যতই তাহাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য, ও বল-বিক্রম নিঃশেষ হইয়া যাইবে। একই দিনে, একই সময়ে, একই ধীবরের নিকট হইতে একই জাতীয় মৎস্যের শিশু লইয়া দুই স্থানে ছাড়িয়া দেও—কতকগুলিকে প্রকাণ্ড জলাশয়ের প্রশস্ত জলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ কর, অপরগুলিকে একটী অল্পায়তন উদপানের মধ্যে ছাড়িয়া দেও ; তৎপরে দুই বৎসর পরে একই দিনে উক্ত উভয় স্থান হইতে মৎস্য ধর, দেখিবে উভয়ে কত প্রভেদ ! জল-কলসের মধ্যে মৎস্য জিয়ান থাকিলে যেমন কদাকার হয়, তেমনি ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে, ক্ষুদ্র আদর্শের মধ্যে রাখিলে, মানবাত্মাও ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যায়। তখন তাহার চিন্তা ক্ষুদ্র, আলাপ ক্ষুদ্র, আমোদ ক্ষুদ্র, আকাজ্ক্ষা ক্ষুদ্র, সমুদায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

আমাদের দৈনিক জীবনটা যে, সমগ্র জীবন নয়, তাহা স্মরণ রাখিয়া এই জীবনের মধ্যে বাস করিলে, আমরা ইহার মধ্যে অনাসক্ত ভাবে বাস করিতে পারি। মহতের জ্ঞান ও মহতের ধ্যান হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাস করিলেও মন ক্ষুদ্রতার দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না। তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেছ, এবং তদপেক্ষা কোনও মহত্তর বিষয়ের জন্য আকাজ্ক্ষা করিতেছ, ততক্ষণ কখনই তুমি সেই ক্ষুদ্রে আসক্ত হইতে পার না। অনাসক্ত ভাবে এ জীবনে বাস করিবার সঙ্কেত এই। জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিলে যে কেবল অনাসক্ত ভাবে জীবনে বাস করা যায় তাহা নহে জীবন-পথের অনেক পাপ প্রলোভন হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। মনকে সর্ব্বদা মহৎ ও পবিত্র বিষয়ে রত রাখাই জীবনকে পবিত্র রাখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও সাধন করা, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন-প্রণালীর একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে।

অপরা বিদ্যা ।*

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে ।

উপনিষদ ।

অর্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ, এ সকলের বিদ্যা অপরা বিদ্যা—আর সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা যদ্দারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিতে পারা যায় ।

যে উপনিষদ গ্রন্থ সকল এদেশে শ্রুতির মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে শ্রুতির হীনতা-বাচক পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। ভিতরকার কথা এই, এতদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে উপনিষদ গ্রন্থগুলির একটা বিশেষ স্থান আছে। সে সময়ের সাধারণ লোকে যে সকল অসার যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিমল ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশেই ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিদেহাধিপতি জনক এই উপনিষদকার ঋষিগণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। বেদোক্ত লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্য এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; সুতরাং এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদের অনেক স্থলেই ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামক অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গার্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ-সহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি ?

---

* ১৮৯৬ সাল, ১৬ই আগষ্ট রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অর্থ—হে গার্গি! কোনও ব্যক্তি যদি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা প্রভৃতি করে তাহার সে সকল বিফল হয়।

উপনিষদকার ঋষিগণ সময়ে সময়ে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন যাগ যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন বেদজ্ঞতার হীনতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বচনটী তাহার নিদর্শন স্বরূপ। কেবল যে উপনিষদেই বেদ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা-সূচক বচন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপ বচন পাওয়া যায়। ভগবদগীতাতে আছে :—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

অর্থ—সমগ্র দেশ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইলে মানুষের সামান্য উদপানে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, তেমনি ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষেও সমুদায় বেদে ততটুকু প্রয়োজন।

এখানেও ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তুলনায় বেদবেদাঙ্গ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু অপরা বিদ্যা বলিতে কেবল বেদ বেদাঙ্গের বিদ্যা বুঝিতে হইবে না। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, তর্ক প্রভৃতি সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। এই অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা হীন হইলেও কি ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই? হীন বোধে কি এ সকল উপেক্ষণীয়? আমরা জানি এ দেশীয় ধর্ম্ম-সাধকদিগের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ঈশ্বরের শ্রবণ মনন, ও তাঁহার সেবাই মানবাত্মার মুক্তির সোপান, লৌকিক জ্ঞান লাভের চেষ্টার প্রয়োজন কি? ইহাদিগকে বলা আবশ্যক যে, অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা হইতে নিকৃষ্ট হইলেও মানব-জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সে প্রয়োজনীয়তা কোনও লৌকিক প্রয়োজনীয়তা নহে। আমরা সকলেই জানি যে মানুষ নানা প্রকার পার্থিব ইষ্ট-সিদ্ধির বাসনাতে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ধন লাভ হইয়া থাকে; এজন্য অনেকে অপরা বিদ্যার সেবা করে। কিন্তু ইহা বিদ্যার আলোচনার

অতি নিকৃষ্ট ভাব। এভাবে যাঁহারা অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সচরাচর ধন লাভের উপায় হইবামাত্র সে বিদ্যার চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমান শিক্ষিত দলের মধ্যে শত শত দেখিতে পাইতেছি। তৎপরে অপরা বিদ্যা আর এক ভাবে অনুশীলিত হইতে পারে ;—তাহা যশোলাভের জন্য। ধনাগমস্পৃহা অপেক্ষা যশঃস্পৃহা কিঞ্চিৎ উন্নত। বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য মানুষকে গভীররূপে জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, বিদ্যানুশীলনে ঐকান্তিক ভাবে মনোনিবেশ করিতে হয়, অনলস হইয়া সাহিত্য চর্চ্চাতে কালযাপন করিতে হয়, এবং এ শ্রমের আর অবসান হয় না। ইহাও মানবাত্মার পক্ষে ভাল। তৃতীয়তঃ মানুষ সুখের জন্য অপরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারে। সে সুখ দুই প্রকার, প্রথম কৌতূহল বৃত্তির চরিতার্থতা জনিত সুখ, দ্বিতীয় মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। এ জগতে অনেক ব্যক্তি কেবলমাত্র কৌতূহল বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন। নূতন নূতন বিষয় জানিলে, মনে চমৎকারিত্ব-প্রসূত এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, অনেক বিদ্বান ব্যক্তি সেই আনন্দের লোভেই অপরা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ইহার অধিক আর কোনও উচ্চতর ভাব নাই। কিন্তু এই ভাব অপর দুই ভাব হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে।

বিদ্যার অনুশীলনে আর এক প্রকার সুখ আছে, মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন, তাহাদিগের চালনা করিলেই আমাদের চিত্তে এক প্রকার সুখোদয় হইয়া থাকে। তাহাদের রক্ষা ও বিকাশের জন্য চালনার প্রয়োজন, এই জন্য বোধ হয় মঙ্গলময় বিধাতা তাহাদের চালনার সঙ্গে সুখের যোগ করিয়া দিয়াছেন। শীত কালের প্রাতঃকালে অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কুক্কুরগণ অকারণ দৌড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও অপর পশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, বা কোনও আসন্ন বিপদ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু তাহা নহে, তাহারা দৌড়িবার জন্যই দৌড়িতেছে। ইহার কারণ এই, দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে

তাহাদের অঙ্গ সকলের চালনা জনিত যে সুখ হয়, সেই সুখের লোভেই তাহারা ঐ প্রকার করিয়া থাকে। অঙ্গ সকলের চালনাতেই এক প্রকার সুখ আছে। তুমি যদি দশদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিমল বায়ুতে সঞ্চরণ কর, একাদশ দিবসে তোমার চিত্ত স্বতঃই সেই সুখ ভোগ করিতে চাহিবে। আমাদের প্রকৃতির গূঢ় সুখ-প্রিয়তা এই প্রকার! ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদের আর বিশ্রাম নাই। হস্তপদগুলি নিরন্তর চলিতেছে। যদি বাধা দেও, যদি ক্ষণকালের জন্য তাহাদের গতিরোধ কর, তখনি দেখিবে শিশুগুলি ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। ক্রন্দন করে কেন? সুখের ব্যাঘাত না হইলে কি ক্রন্দন করে? তাহাদের সেই হস্ত পদের সঞ্চালন এতই সুখজনক যে তাহার অভাবে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। এইরূপ মানসিক বৃত্তি নিচয়ের চালনাতেও এক প্রকার সুখ আছে। সেই সুখটুকুর লোভেই অনেকে অপরা বিদ্যার আলোচনাতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

আমি অপরা বিদ্যার যে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছি তাহা এ প্রকার নহে। পরা বিদ্যার পোষকতা করিবার জন্যই অপরা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। যেমন শাখানদী সকল মহানদীতে পতিত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে, এবং মহানদীর সহিত একীভূত হইয়া মহাসমুদ্রে গমন করে, তেমনি অপরা বিদ্যা সকল পরাবিদ্যাতে সম্মিলিত হইয়া তাহার আয়তন ও বল বৃদ্ধি করে, এবং চরমে মানবকে সেই পূর্ণ পরাৎপর পরম পুরুষের চরণে উপনীত করে। তাঁহাকে লাভ করাই যখন মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, তখন তাহাকে লাভ করা মানবের সকল বিদ্যারও উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যাতেও আমাদের ধর্ম্মজীবনের ও ব্রহ্মসাধনের কিরূপ সহায়তা করিতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়া যাই। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরা বিদ্যার প্রকৃত অনুশীলন দ্বারা মানব-চরিত্র ব্রাহ্মসাধন ও ব্রহ্মলাভের উপযোগী হয়।

প্রথমতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা অনেক সময়ে মানব-চরিত্রে অনাসক্তি উৎপাদন করে। একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের উপকরণীভূত বিবিধ বিষয়ে মনোনিবেশ

করিতে হইলেই মানুষকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইতে ও তাহাদের একটু উপরে উঠিতে হয়। মহাতত্ত্ব সকলের আলোচনাতে মন নিযুক্ত থাকিলে, মন আর ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ের অতীত। তাঁহারা সে সকলের মধ্যে বাস করিয়া ও তাহাতে বাস করেন না।

দ্বিতীয়তঃ—অপরা বিদ্যাতে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে, প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিতে হয়। উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে অসংযত রাখিয়া কেহই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। গভীর তত্ত্বান্বেষণের পক্ষে চিত্তের স্থিরতার নিতান্ত প্রয়োজন। এমন কি পদার্থ বিদ্যাতে যে সকল পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার বিধি আছে, তাহা সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে হইলে চিত্তের স্থিরতা, দৃষ্টির স্থিরতা ও স্নায়ুমণ্ডলের স্থিরতা একান্ত প্রয়োজনীয়। অসংযত ও প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র ব্যক্তি কি কখনও সেই স্থিরতা লাভ করিতে পারে? অতএব একাগ্রচিত্তে অপরা বিদ্যা অনুশীলন করিতে গেলেও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ—অপরা বিদ্যার অনুশীলনের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে, মানুষের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হয় ও আত্ম-দৃষ্টি জাগে। চিন্তাশক্তির উন্মেষ একবার হইলে, সে শক্তি আর কেবলমাত্র বাহিরের পার্থিব বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও প্রসারিত হয়। সেই চিন্তাশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তনে এবং জগত ও আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচারে নিযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা হৃদয় মনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জগতের কিছু না জানিলে মানুষ স্বভাবতঃই আপনার যাহা আছে, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে থাকে। যতই জগতের সহিত পরিচয় বৃদ্ধি হয়, ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের উন্নতি ও অবনতির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতে থাকে, ততই মানুষের মন উদার হইতে থাকে; ততই মানুষ মনে করে আমি আজ যেরূপ ভাবিতেছি এরূপ আর কত শত শত ব্যক্তি ভাবিয়াছে, আমি যাহাকে অকস্মাৎ উৎপন্ন মনে করিতেছি

তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মিয়াছে, আমি যে তত্ত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি শত শত ব্যক্তি সেই তত্ত্বকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এই তুলনার বিচার দ্বারা মানব-চিত্ত উদারতা লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—প্রকৃত ভাবে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিলে মানব-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিনয়ের সঞ্চার হয়। বিদ্যার সহিত বিনয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রে বলিয়াছে—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—বিদ্যা বিনয়কে দান করে। যদিও অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে অপরা বিদ্যা বিনয়কে প্রসব না করিয়া অহমিকাকেই প্রসব করিতেছে, তথাপি বিদ্যার সহিত বিনয়ের যে গূঢ়যোগ আছে, তাহা সুনিশ্চিত। প্রকৃত বিদ্যা যেখানে আছে, সুগভীর তত্ত্বান্বেষণ যেখানে আছে, সেই স্থানেই মানবের নিজের অজ্ঞতা-জ্ঞান সমুজ্জল। কি পদার্থতত্ত্ব কি অধ্যাত্মতত্ত্ব যে রাজ্যেই মানব মন গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, সেই বিভাগেই দুরবগাহ সমস্যা সকলের মধ্যে পতিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, যে এ ব্রহ্মাণ্ডে মানব ঘোর অজ্ঞতাতে জড়িত। মানব এজগতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় যবনিকার অন্তরালে বসিয়া আছে। সেই যবনিকা ভেদ করিয়া যে দুই এক রশ্মি আলোক আসিতেছে, তাহাতেই আপনাকে ও আপনার পিঞ্জরকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিতে পাইতেছে, এইমাত্র। এরূপ অবস্থাতে মানব-মনে বিনয়ই শোভা পায়।

ষষ্ঠতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও বিভাগে আমরা দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সকল বিভাগেই সেই জ্ঞানময় পুরুষের অপার জ্ঞানের লীলা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং অপরা বিদ্যা যে বিভাগেই গমন করুক না কেন, বিনীত ও প্রেমিক ব্যক্তির চক্ষে সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, অপরা বিদ্যা অনাসক্তিকে উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত করে, চিন্তাশক্তির উন্মেষ করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগরূক করে, দীনতাকে উৎপন্ন করে, ও চিত্তে ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত

করিয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল কি আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায় নহে? অথবা বিদ্যার আলোচনাকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ-স্বরূপ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং। *

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

অর্থ—ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত উক্তিটী আমাদের দেশে সুপ্রচলিত। ক্ষুদ্র ও মহৎ, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও রমণী প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়,—"একজন ধর্ম্ম আছেন ত, তিনিই রক্ষা করেন।" কিন্তু এ কথার প্রকৃত অর্থ কি?

চীন দেশীয় মহাপুরুষ কংফুচকে একবার তথাকার কোনও এক রাজা প্রশ্ন করিলেন,—"হে সুধী-শ্রেষ্ঠ! রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ও প্রজা মণ্ডলীকে সুশাসনে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে দুষ্ট প্রজাদিগকে অথবা রাজ্যের শত্রুদিগকে হত্যা করা কি আবশ্যক নয়?" মহামতি কংফুচ উত্তর করিলেন,—"হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন হইয়া ন্যায়পরায়ণতার সহিত স্বীয় রাজকার্য্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে রাজ্য সুশাসনে রাখিবার জন্য আপনাকে কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে না এবং দেখিবেন বায়ু প্রবাহিত হইলে ক্ষেত্রের শস্য সকল যেমন তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে, তদ্রূপ আপনার প্রজাগণও আপনার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে। কংফুচের বক্তব্য এই ছিল যে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মের শাসনাধীন। মানব-হৃদয়কে শাসনে রাখিবার জন্য ধর্ম্মাস্ত্রের ন্যায় অস্ত্র আর নাই। যে অকপটচিত্তে এজগতে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারে সে নিরাপদ। ইতিবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজ ও স্পেনীয় প্রভৃতি ইউরোপবাসী শ্বেতকায় খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে দেশে গিয়া নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন, সে সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই? এই সকল জাতি

* ১৮৯৬ সাল, ১৬ইআগষ্ট রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

সেখানে গিয়াই শারীরিক বলের দ্বারা,অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা, তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; রণে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের ভূ-সম্পত্তি সকল হরণ করিলেন এবং পশুযূথের ন্যায় দলে দলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তখন সেই সকল অত্যাচরিত অধিবাসীগণ কি করিল? তাহারা স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া বনে বনে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঐ সকল শ্বেতকায় জেতাদের প্রতি বিবিধ প্রকারে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ পাইলেই কোনও না কোনও প্রকারে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের রমণীদিগকে পথে ঘাটে পাইলে, হরণ করিয়া লইয়া যাইত; অথবা দস্যুতা করিয়া ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঐ সকল বিজিত লোকের উপদ্রবে ইহাঁরা সুস্থির হইয়া বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু উইলিয়ম পেন নামক সুবিখ্যাত কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী পুরুষ যখন সেখানে গিয়া সৌজন্য সদ্ভাব ও ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন তখন সেই সকল আদিম অধিবাসীই তাঁহার বশীভূত হইল। এমন কি পেনকে তাহারা দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সহিত যে সন্ধিপত্র করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কখনও ভঙ্গ করে নাই। তরবার যাহা করিতে পারে নাই, ধর্ম্ম ও সাধুতা তাহা করিয়াছিল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি কংফুচের কথা অতীব সত্য,—"বায়ুর গতির অগ্রে যেমন ক্ষেত্রের শস্য মস্তক অবনত করে, ধার্ম্মিক রাজার সম্মুখে সেইরূপ প্রজা সকল ও মস্তক অবনত করে।" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এই উক্তিকে আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা এই। এজগতে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা পার্থিব ও পাশব বলের উপরে অধিক নির্ভর করে; তাহারা ধন বল, জন বল ও বুদ্ধিবলের উপরে নির্ভর করিয়া জগতে চলিতে চায়; তাহাদের দৃষ্টি ধনের উপরে, সহায় সম্বলের উপরে এবং আপনাদের বুদ্ধির উপরে। কাহারও সহিত যদি বিবাদ আরম্ভ হয় তখন তাহারা মনে করে,—"আমার এত টাকা আছে, আমি এত বড় ধনী, অমুক ব্যক্তি আমার

সহিত বিবাদ করিয়া বাঁচিবে? আবার কেহ বা আপনার প্রখর মেধার উপরে নির্ভর করিয়া তাহার বিপক্ষ ব্যক্তিকে শাসাইয়া বলে,—"কি হে বাপু! আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তুমি তিষ্ঠিবে? আমার বুদ্ধির সম্মুখে, আমার চক্রান্তের নিকটে তুমি দাঁড়াইবে?" কোনও দেশেই কোনও সমাজই এই লোকের অপ্রতুল নাই। এই সকল লোক মূর্খের শেষ; ইহারাই প্রকৃত ছোট লোক। ধর্ম্মের উপরে বিশ্বাস রাখিবার শক্তি ইহাদের হয় না।

যাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে যীশুর মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্য ষ্টিফেন যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন য়িহুদীগণ ইষ্টক ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তাহারা পাশব বলের দ্বারা ধার্ম্মিকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে নষ্ট করিতে চাহিল। কিন্তু কালে ষ্টিফেনেরই মত জগতে প্রবল হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন তখন তিনি 'ব্রহ্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। তখন ইহার সভ্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কলিকাতার ধনিগণ সকলে একত্র হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভাকে বিনাশ করিবার জন্য 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ ধনী এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা চাঁদা করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সভা হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল রাম-মোহন রায়ের কুৎসা এবং নিন্দা বাহির হইত। আমি রাজার সম-সাময়িক কোনও এক জন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে এই ধর্ম্ম সভার অধিবেশনের দিন এক মাইল রাস্তা ব্যাপিয়া ইহাদের গাড়ী দাঁড়াইত এবং সভা ভঙ্গ হইলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সকলে বলাবলি করিতেন, "স্ত্রীলোকেরা যেমন অঙ্গুলির দ্বারা চাপ দিয়া পুঁটিমাছের পোঁটা বাহির করে, আমরাও সেইরূপ করিয়া রামমোহন রায়ের সভার পোঁটা বাহির করিব।" আপ-নাদের ধন বল; জন বলের প্রতি তাঁহাদের প্রধান নির্ভর ছিল কিন্তু পরিণামে কি হইল? তিনি ত তাঁহার সভাকে তদবস্থায় রাখিয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সভা ত এক প্রকার

উঠিয়াই গিয়াছিল! কিন্তু এখন কি দাঁড়াইয়াছে? এখন সেই পুঁটি মাছের পোঁটাতে কাঁটা জন্মিয়া লোকের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। মূর্খেরা মনে করে, পার্থিব ও পাশব বলের দ্বারা, কুৎসা ও গ্লানি রটনা দ্বারা ধর্ম্মকে নষ্ট করা যায়। জগতের ইতিবৃত্তে সত্যের পরাজয় কি কখনও হইয়াছে? বিষ প্রয়োগে সক্রেটিসের প্রাণ গেল; কিন্তু সক্রেটিসের কি মৃত্যু হইয়াছে? তিনি "Father of Eastern Philosophy" হইয়া চিরদিনই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর আচরণে লোক যীশুর প্রাণবধ করিল, কিন্তু তিনি চিরদিনই অমর হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আজ রুশিয়ার সম্রাটের মস্তক "প্রভু, প্রভু" বলিয়া সেই সূত্রধর তনয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। জগতের মূর্খ ব্যক্তিরা ধন, মান, পাশব অত্যাচার, নিপীড়ন এই সকলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা, সাধুরা ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করেন। তাঁহারা তুলাদণ্ডের এক দিকে বিন্দু পরিমাণ সত্যকে এবং অপর দিকে জগতের প্রভূত পার্থিব সম্পদ রাখিয়া দেখিয়াছেন, ধর্ম্মই ভারী হইয়াছে। একটী সর্ষপ পরিমাণ ধর্ম্মের তুলনায় হিমালয় সমান পার্থিব সম্পদকে তাঁহারা অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হয় না। এপৃথিবীতে বাস করিবার জন্য মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকল তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। মানুষ আপনা হইতেই সে সকল সাধুদিগকে প্রদান করে। ধর্ম্মের যে পোষাকটা, তাহার যে খোসাটা, তাহার যে নকলটা, তাহারই জগতে কত আদর! কত সম্মান! প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পাইলে ত, কথাই নাই। আমার সহিত চল, উভয়ে গৈরিক বসন পরিধানে বাহির হই, একটী পয়সা সঙ্গে লইতে হইবে না, অথচ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিব। উত্তম আহার করিবে, উত্তম স্থানে বাস করিবে, অবশেষে হৃষ্ট পুষ্ট দেহ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ধর্ম্মের পরিচ্ছদেরও এত আদর! এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী অতি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। একবার একজন নবাব মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি কোনও সাঁচ্চা অর্থাৎ আসল ফকির পান, তবে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন। এমন

ফকির দেখিয়া বিবাহ দিবেন যাহার আর জগতে কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই এবং এক কপর্দ্দক সম্বল নাই। তখন নবাব খাঁটি ফকির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদি শুনিতে পান যে, তাঁহার রাজ্যের নিকটে কোনও ফকির আসিয়াছে, অমনি তাঁহার নিকটে নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। যাহার কিঞ্চিৎ লালসা দেখেন তাহাকেই নকল ফকির বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক দিন গেল, মনের মত ফকির পাইলেন না। অবশেষে অপর কোনও দেশের নবাবের এক পুত্র কোনও প্রকারে সেই কন্যার গুণের কথা শুনিয়া বা রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেরূপে পারি, এই কন্যাকেই বিবাহ করিতে হইবে।" এক দিন সেই যুবক নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আমি অমুক নবাবের পুত্র; আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া যদি উঁহাকে আমার সহিত বিবাহ দেন, তবে আমি পরম উপকৃত হই।" তখন নবাব উত্তর করিলেন, "আমি সাঁচ্চা ফকির দেখিয়া আমার কন্যার বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।" তখন সেই যুবক নিরাশ অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং ফকিরের বেশ পরিধান করিয়া ফকির সাজিল। এক বৎসর অতীত হইলে ফকির বেশধারী সেই যুবক আসিয়া নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে একস্থানে বাস করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল যে আর একজন ফকির আসিয়াছে। নবাব প্রথমতঃ তাহার নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ফকির দূতকে বলিলেন, "সে কি? আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার উপঢৌকনের প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় নবাব তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজভবনে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ফকির বলিলেন, "এ প্রস্তাব ত মন্দ নয়? কত লোক আমার নিকট নিত্য আসিতেছে, আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজভবনে গিয়া বসিয়া থাকি। নবাব সাহেবের প্রয়োজন হয় ত এখানে আসুন। আমার যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া নবাব ভাবিলেন এইবারে যথার্থ সাঁচ্চা ফকির পাইয়াছি, ইহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ওদিকে সেই ফকিরের হৃদয়ে ঘোর

পরিবর্তন উপস্থিত। তিনি ভাবিলেন,—"যে জিনিসের পোষাকের এত মূল্য, যাহার ছালের দাম এত, তাহার ভিতরটার না জানি কেমন! আমি ধর্ম্মের নামে কপটতা করিতেছি, তাহাতেই লোকে আমাকে এত সম্মান করিতেছে, আসল ধর্ম্ম তবে না জানি কেমন! আমাকে সেই আসল বস্তু লাভ করিতে হইবে।" তৎপরে যখন নবাব স্বয়ং ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে সাধো! আপনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" তখন ফকির বলিলেন,—"মহারাজ! আমি অমুক দেশের নবাবের পুত্র। এক বৎসর পূর্ব্বে আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, তখন আপনি বলিয়াছিলেন যে, সাঁচ্চা ফকির পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন। আপনার কন্যাকে লাভ করিবার জন্যই আমি এই সকল প্রতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমার অন্তরে এই প্রতিজ্ঞার উদয় হইয়াছে, "যাহার নকলের এত সম্মান, তাহার আসল কি প্রকার তাহা আমি দেখিব। আর আপনার কন্যাকে পাইবার ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া ফকির চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্মান সর্ব্বত্র, সে ব্যক্তির কোনও প্রকার পদার্থের অভাব হয় না। যীশু বলিয়াছেন,—"শৃগাল কুকুরের শয়ন করিবার গর্ত্ত আছে; আকাশের পক্ষিগণের থাকিবার স্থান আছে; আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" অথচ তিনি ইচ্ছামাত্র অনায়াসে দুই হাজার লোককে আহার করাইতে পারিতেন। এ দেশে একটী কথা প্রচলিত আছে, "সাধু সাপের ন্যায়; ইন্দুর গর্ত্ত করে, সাপ তাহাতে বাস করে; তেমনি বিষয়ী লোক বিষয় করে, সাধুরা তাহা ভোগ করেন।"

চতুর্থতঃ এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহাকে যতই উৎপীড়ন করুক না কেন, তিনি তদ্দ্বারা আপনার হৃদয়কে কলুষিত হইতে দেন না। তিনি দৃঢ়রূপে ধর্ম্মের পথে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। অবশ্য একথা সত্য যে তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, এবং লোকে তাঁহাকে নির্য্যাতন করে; কিন্তু তিনি নিজে বিদ্বেষ-বুদ্ধির অতীত হইয়া বাস করেন।

লোকের উৎপীড়নে, লোকের বিদ্বেষে তিনি প্রতিহিংসা-পরবশ হন না। তাঁহার মন ঠিক্ জলের ন্যায়, জলে যেমন যতই আঘাত কর, তাহাতে দাগ পড়ে না, তাঁহার মনেও সেইরূপ লোকের হিংসা বিদ্বেষের দাগ পড়ে না। বরং তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করেন।

পঞ্চমতঃ এই উক্তির সর্ব্ব শেষ ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি চাতুরীর হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য কোনও প্রকার অসাধু উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন না। তিনি বাঁকা পথ ভুলিয়া গিয়া সরলভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অসাধু লোক মিথ্যার উপরে মিথ্যা, তদুপরি মিথ্যা এইরূপে ক্রমাগত মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে গুটিপোকার ন্যায়, মিথ্যার জালে জড়াইয়া মারা পড়ে; সাধু ব্যক্তি সত্যপথ ধরিয়া চলিয়া অনায়াসে আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া লন।"

এইরূপে চিন্তা করিলে এই উক্তির আরও অনেক প্রকার ভাব বাহির করা যায়। আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে বিদ্বেষ, হিংসা, চতুরতা, কপটতা এ সকলের অতীত হইয়া বাস করিতে হইবে। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে স্থির থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিব, তাহার জন্য নিন্দা প্রশংসা, সম্পদ, বিপদ সকলই অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশের নিকটে অপর সকলই উপেক্ষা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগকে এই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। যখন কেহ একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করে, তখন সে ব্যক্তি কি করে? সে ব্যক্তি হয় ত আট মাস কি দশ মাস ধরিয়া দিবানিশি চিন্তা করিয়া একটী পরামর্শ স্থির করিল এবং তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিল। যখন তাঁহার বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, তখন কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"এ ঘরটা এখানে না হইলে ভাল হইত। কেহ বলিল,—"প্রাঙ্গণটা এখানে না করিয়া একটু দূরে করিলে ভাল হইত।" আবার কেহ বা বলিল,—"না, না, ঠিক হইতেছে।" এইরূপে কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল; কিন্তু ছয় মাস পরে যখন সম্পূর্ণ বাড়ীটা প্রস্তুত হইল, তখন লোকে বলিতে লাগিল,—ওঃ আপনার মনে এই পরামর্শটা ছিল, এত বেশ হইয়াছে।"

তখন লোকে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমাদিগকেও এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে। এখন আমাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময়। এক্ষণে লোকের নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই উপেক্ষাবুদ্ধির সহিত দেখিতে হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। তোমরা লোকের মুখের প্রতি তাকাইও না। প্রভু পরমেশ্বরের মহান্ আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। তাহাতে যে প্রশংসা করে করুক, যে নিন্দা করে করুক। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক; শুনে চলি তোমারি ডাক" এইটী ব্রাহ্মদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এইটী ব্রাহ্মদের কবচ। হে ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই ধর্ম্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পার, তবেই তোমরা জীবনের স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা এই ভাবে তাঁহার মহান্ ধর্ম্ম পালন করিতে পারি।